কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি:স্থানিক জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব পর্যালোচনা

(ROHINGYA IN COX'S BAZAR DISTRICT: IMPACT ON LOCAL COMMUNITY)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের শর্তপূরনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম.ফিল. গবেষক

মোহাম্মদ আবু জাফর
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২৮৮, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জমা দেওয়ার তারিখ: জুন ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, “কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি: স্থানিক জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব পর্যালোচনা” শীর্ষক গবেষণা কর্মটি মোহাম্মদ আবু জাফর, এম.ফিল. গবেষক কর্তৃক আমার তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনাক্রমে সম্পাদিত হয়েছে। আমার জানামতে, এটি একটি মৌলিক গবেষণা যা অন্য কোন জার্নাল অথবা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমার জন্য জমা দেয়া হয়নি।

আমি এটি গ্রহণ করছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে জমা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করছি।

তারিখ:

ড. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

“কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি: স্থানিক জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব পর্যালোচনা” শিরোনামে গবেষণা কাজটি মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম.ফিল. থিসিস হিসাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন এর কাছে যিনি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে থিসিস নিয়ে কাজ করার অনুমতি ও সুযোগ দিয়েছেন এবং শত ব্যস্ততার মাঝে গবেষণা কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, নতুবা এই কাজটি হয়তো শেষ করা সম্ভব হতো না। তিনি তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ, নির্দেশনা এবং আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করার উৎসাহ দিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, সুফিয়া কামাল গন গ্রন্থাগার, ঢাকা এবং অন্যান্য যারা আমাকে প্রয়োজনীয় বই, জার্নাল, সাময়িকী ও এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের সাবইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাকে এম.ফিল. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান ২০১৯ এর জন্য মনোনয়ন প্রদান করে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ গ্রহনে আর্থিক সহায়তা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য। আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাকে এম.ফিল. ডিগ্রী অর্জনের জন্য দুই বছরের শিক্ষা ছুটি অনুমোদনের জন্য।

পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বিশেষ করে আমার স্ত্রী, তিন সন্তান এবং মা যাদের ত্যাগের কারনেই আমার গবেষণা কাজটি যথাসময়ে সম্পন্ন করতে পেরেছি, তাদের প্রতি অশেষ ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া যে সকল বন্ধু, সুভাকাঙ্খী,

Dhaka University Institutional Repository

সহকর্মী গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আবু জাফর
এম.ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২৮৮, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, “কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি: স্থানিক জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব পর্যালোচনা” শীর্ষক গবেষণা কর্মটি একটি মৌলিক গবেষণা, যা ড. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে। এই গবেষণা কর্মটি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি বা অন্য কোনো গবেষণা থেকে কপি করা হয়নি।

এই থিসিসে গবেষণালব্ধ তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়নি।

উপস্থাপনায়

মোহাম্মদ আবু জাফর
এম.ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২৮৮, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রস্তাবিত গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের পরিচিতি

AFP	Agence France Presse
AI	Amnesty International
ARRA	Administration for Refugee and Return Affairs
ARSA	Arakan Rohingya Salvation Army
ASEAN	Association of South East Asian Nations
BBS	Burma Broadcasting Service
BIPSS	Bangladesh Institute of Peace and Security Studies
BSPP	Burma Socialist Programme Party
CGA	Crisis Group Asia
EC	European Commission
EU	European Union
FDMN	Forcibly Displaced Myanmar Nationals
HRW	Human Rights Watch
HIV	Human Immunodeficiency Virus
HuJI	Harkat-ul-Jihad-al-Islam
ICJ	International Court of Justice
ICC	International Criminal Court
IAWG	Inter-Agency Working Group
ICG	International Crisis Group
IPS	Inter Press Service
IOM	International Organization for Migration
ISCG	Inter Sector Coordination Group
JRP	Joint Response Plan
JMB	Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh
MoU	Memorandum of Understanding
MSF	Medicins Sans Frontiers
NLD	National League for Democracy
NGOs	Non-Governmental Organizations
NDTV	New Delhi Television
NRS	Northern Rakhine State
NYT	The New York Times
OIC	Organization of Islamic Cooperation
RRRC	Office of the Refugee Relief and Repatriation Commissioner
RSO	Rohingya Solidarity Organization
SAARC	South Asian Association for Regional Cooperation
SLORC	State Law and Order Restoration Council
STD	Sexually Transmitted Diseases
TWS	Teknaf Wildlife Sanctuary
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Programme
UN OCHA	United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UN-Habitat	United Nations Human Settlements Programme

UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UDHR	Universal Declaration of Human Rights
WHO	World Health Organization

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রত্যয়নপত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii - iv
ঘোষণাপত্র	v
প্রস্তাবিত গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের পরিচিতি	vi- vii
সূচিপত্র	viii-xii
মানচিত্র/স্থিরচিত্র/সারণি তালিকা	xiii
সারসংক্ষেপ (Abstract)	xiv- xv

প্রথম অধ্যায় ভূমিকা		১
১.১	প্রস্তাবনা	১
১.১.১	রোহিঙ্গা সংকটের প্রেক্ষাপট	১-২
১.১.২	রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু	২-৩
১.১.৩	বাংলাদেশে রোহিঙ্গা আগমনের ইতিহাস	৩-১১
১.২	সমস্যার বিবরণ	১১-১৮
১.৩	গবেষণার তাৎপর্য	১৮-১৯
১.৪	গবেষণার উদ্দেশ্য	১৯
১.৫	গবেষণা পদ্ধতি	১৯-২০

১.৬	গবেষণার অধ্যায় বিন্যাস	২০
দ্বিতীয় অধ্যায় ধারনাগত কাঠামো এবং সাহিত্য পর্যালোচন		**২১**
২.১	ভূমিকা	২১
২.২	প্রায়োগিক সংজ্ঞা/ প্রামান্য সংজ্ঞা:	২১-২২
২.২.১	রিফিউজি/ উদ্বাস্তু:	২১-২২
২.২.২	গ্রহণকারী জনগোষ্ঠী/ স্থানিক জনগোষ্ঠী	২২-২৩
২.২.৩	উদ্বাস্তু এবং অভিবাসীর মধ্যে পার্থক্য	২৩-২৪
২.২.৪	স্থানিক জনগোষ্ঠীর উপর উদ্বাস্তুর বোঝা এবংকল্যাণ/সুবিধাসূহ	২৪
২.২.৫	আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু আইন ও নীতি	২৪-২৫
২.২.৬	দেশের নাগরিক এবং উদ্বাস্তুদের অধিকারের অসামঞ্জস্যতা	২৫-২৬
২.৩	সাহিত্য পর্যালোচনা	২৬
২.৩.১	রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী	২৬-২৭
২.৩.২	স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর উদ্বাস্তু আগমনের প্রভাবসমূহ	২৭
২.৩.২.১	উদ্বাস্তু আগমনে স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর আর্থ-সামাজিক প্রভাব	২৮-৩০
২.৩.২.২	সামাজিক প্রভাব হিসাবে সহিংসতা	৩০-৩১
২.৩.৩	উদ্বাস্তু আগমন এবং উপস্থিতির রাজনৈতিক প্রভাব	৩১-৩২
২.৩.৪	উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর পরিবেশগত প্রভাব	৩২
২.৩.৫	নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ	৩৩

২.৪	উপসংহার	৩৩
তৃতীয় অধ্যায় রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস এবং বাংলাদেশে আগমন		৩৪
৩.১	ইতিহাস ও পটভূমি	৩৪-৩৬
৩.২	রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পরিচিতি এবং চ্যালেঞ্জ	৩৭-৩৮
৩.৩	রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি সামরিক সরকারের নীতিগত অবস্থান	৩৮-৪০
৩.৪	মিয়ানমারের জাতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারন	৪০-৪২
৩.৫	রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেক	৪৩-৪৪
৩.৬	বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু	৪৪-৪৫
চতুর্থ অধ্যায় রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া		৪৬
৪.১	বৈশ্বিক মানবাধিকার আন্দোলনের পটভূমি	৪৬-৪৮
৪.২	রাখাইন প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান	৪৮
৪.৩	মিয়ানমারে মানবাধিকার লংঘন	৪৮-৫৩
৪.৪	রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জন্য বৈধ ও আইনানুগ কাঠামো	৫৩-৫৫
৪.৫	কক্সবাজারের স্থানিক জনগোষ্ঠী ও উদ্বাস্তুদের মধ্যকার সম্পর্ক	৫৫
৪.৬	উদ্বাস্তু ক্যাম্প পরিস্থিতি	৫৬-৫৭
৪.৭	উদ্বাস্তু বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি	৫৮

৪.৮	মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বিষয়ে জাতিসংঘের পদক্ষেপ	৫৮-৬০
৪.৯	রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় স্টেকহোলডারদের সাড়াদান	৬০-৬১
৪.৯.১	রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম	৬১-৬৩
৪.৯.২	কূটনৈতিক উদ্যোগ	৬৩-৬৪
পঞ্চম অধ্যায় বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের অন্তঃপ্রবাহ এবং স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর এর প্রভাব		৬৫
৫.১	ভূমিকা	৬৫
৫.২	বাংলাদেশ এবং রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু	৬৫
৫.৩	রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু শিবির	৬৬-৬৯
৫.৪	স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাব	৬৯
৫.৪.১	রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের সামাজিক প্রভাব	৬৯-৭২
৫.৪.২	রোহিঙ্গাদের মাঝে জেন্ডার বৈষম্য	৭২
৫.৪.৩	রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের রাজনৈতিক প্রভাব	৭২-৭৩
৫.৪.৪	রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের অর্থনৈতিক প্রভাব	৭৩-৭৭
৫.৪.৫	স্বাস্থ্য খাতে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের প্রভাব	৭৭
৫.৪.৬	রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের পরিবেশগত প্রভাব	৭৮-৭৯
৫.৪.৭	রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের নিরাপত্তাজনিত প্রভাব	৭৯-৮২
৫.৪.৮	মাদক, অস্ত্র ও মানব পাচার	৮২-৮৩
৫.৫	উপসংহার	৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায় **রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় কার্যকরী পদক্ষেপ**		৮৪
৬.১	রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকট সমাধানের সম্ভাবনা	৮৫-৮৬
৬.২	রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকট সমাধানে স্টেকহোল্ডারদের পদক্ষেপসমূহ	৮৬-৮৯
সপ্তম অধ্যায় **উপসংহার ও সুপারিশমালা**		৯০-৯৩
তথ্যপঞ্জি		৯৪-১১৪

মানচিত্র/স্থিরচিত্র/সারণি তালিকা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
চিত্র-১	কক্সবাজার জেলার মানচিত্র	১৩
চিত্র-২	রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোর অবস্থান এবং ২৫ আগস্ট ২০১৭ সাল পরবর্তি সময়ে মিয়ানমার থেকে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা	১৫
চিত্র-৩	২৫ আগস্ট, ২০১৭ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত রোহিঙ্গা গ্রাম	৫১
চিত্র-৪	মানচিত্রে কক্সবাজার উদ্বাস্তু শিবির	৫৬
চিত্র-৫	স্থিরচিত্রে কক্সবাজার উদ্বাস্তু শিবির	৫৭

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি-১	চাহিদা মাফিক তহবিল গঠনের অগ্রগতি (১০নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)	৬২
সারণি-২	সংস্থা ভিত্তিক ত্রাণ	৬২-৬৩
সারণি-৩	২০১৫ সাল পর্যন্ত মিয়ানমার থেকে আগত নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উদ্বাস্তুর সংখ্যা	৬৬-৬৭
সারণি-৪	কক্সবাজারের বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর পরিসংখ্যান (২০১৮ সাল পর্যন্ত)	৬৭

সারসংক্ষেপ (Abstract)

মিয়ানমারের রাখাইন স্টেটের ভাষাভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক একটি মুসলিম সংখ্যালঘু জাতি রোহিঙ্গা। নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকার বঞ্চিত দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মিয়ানমার রাষ্ট্র কর্তৃক পরিকল্পিত গনহত্যা ও জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়ার কারনে সীমিত সম্পদের ওপর মারাত্মক চাপ পড়েছে। ধর্ম, ভাষা ও রাজনৈতিক কারনে মিয়ানমার কর্তৃক বিতাড়িত, নির্যাতন, নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার রোহিঙ্গারা ১৯৭০ সাল থেকে সমুদ্র ও নদী পথে সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর অন্তঃপ্রবাহ শুরু হলে সীমান্ত অঞ্চল ও কক্সবাজার জেলার স্থানিক জনজীবনে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত দশ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্প ও স্থাপনায় বসবাস করছে। প্রতিবছর ৪৫ হাজার রোহিঙ্গা শিশুর জন্ম হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছর যাবত বাংলাদেশ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের সহায়তা নিয়ে উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প নির্মান, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। স্থানিক জনগোষ্ঠী, স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর এতে মারাত্মক চাপ ও প্রভাব পড়ছে। আমার গবেষণার উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর উদ্বাস্তু উপস্থিতির আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তাজনিত প্রভাব অনুসন্ধান বা পর্যালোচনা করা। গবেষণায় রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু উপস্থিতি ও স্থানিক জনগোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়ার জটিল সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর), আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও মানবাধিকার সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ সরকারের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে সেসব নিয়ে গবেষণায় মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। কয়েক দশক ব্যাপি উদ্বাস্তু উপস্থিতির কারনে কক্সবাজার জেলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাব পড়েছে। ইতিবাচক প্রভাবের মধ্যে রয়েছে সমাজসেবা খাতের সম্প্রসারন, বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারন, ক্ষুদ্র ব্যবসায় সুযোগ বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। বাংলাদেশ একদিকে মানবিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে

উদ্বাস্তুদের অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দিয়েছে ,অন্যদিকে যতদ্রুত সম্ভব প্রত্যাবাসন শুরু করতে বদ্ধপরিকর। তবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, নিরাপত্তার অব্যবস্থাপনা, এবং মিয়ানমারের অনীহার কারনে স্বল্প মেয়াদে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসনের সম্ভাবনা ক্ষীন। উদ্বাস্তু সংকটের ইতিবাচক প্রভাবের তুলনায় নেতিবাচক প্রভাব অনেক তীব্র এবং গভীর উদ্বেগজনক। সংঘাত ও অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ঝুঁকি, অবৈধ মাদক, অস্ত্র ও মানব পাচার এবং হত্যাকান্ড বৃদ্ধি, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্টসহ সামাজিক সংহতির অবনতি ঘটেছে। রোহিঙ্গাদের জন্য মর্যাদা, মানবাধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কৌশল নির্ধারনে বাংলাদেশকে কূটনৈতিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে।

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ প্রস্তাবনা

১.১.১ রোহিঙ্গা সংকটের প্রেক্ষাপট

মিয়ানমার সামরিক সরকার ও উগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যায় অভিরাম আগমন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের জেলা কক্সবাজারের স্থানীক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে সরকারি বাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত সহিংস অভিযানের কারণে নিরাপদ জীবনের আশায় কয়েক লাখ রোহিঙ্গা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে কক্সবাজার ও বান্দরবানের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেয় যেটাকে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনার গনহত্যা বলে অভিহিত করেছেন। United Nations High Commissioner for Refugee(UNHCR) এর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপি নির্যাতন,যুদ্ধ অথবা মানবাধিকার লংঘনের কারনে ৭০.৮ মিলিয়ন লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এদের মধ্যে ২৫.৯ মিলিয়ন শরণার্থী যা এযাবত কালের সবচেয়ে বেশি এবং গত এক দশক আগের চেয়ে চার গুন। শরণার্থী হলো এমন লোকেরা যারা যুদ্ধ, সহিংসতা,সংঘাত বা নিপীড়ন থেকে পালিয়েছে এবং অন্য দেশে নিরাপত্তা খুঁজতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করেছে (UNHCR, 2018)।

শরণার্থীদের বেশিরভাগ তাদের নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকার এবং নিরাপদ ভবিষ্যতের আশায় পালিয়ে আসে (Grinvald, 2010:19) । ১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশন স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের জন্য শরণার্থীদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় দানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে শরণার্থী গ্রহণকারী স্থানিক জনগোষ্ঠী ও দেশকে অনেক পরিনতি ভোগ করতে হয় (Alix Garcia & Saah, 2009; Madanat, 2013; Vas Dev, 2002)। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যে তার সক্ষমতার বাইরে গিয়ে গত কয়েক দশক যাবত মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত জাতিগত ও ধর্মীয় সহিংসতার শিকার এক মিলিয়ন এর বেশি সংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে (Martin, Margesson & Vaughn, 2017)। বাংলাদেশ সরকার

রোহিঙ্গাদেরকে "Forcibly Displaced Myanmar National (FDMN) বলে আখ্যায়িত করেছে,যদিও জাতিসংঘ এদরেক শরণার্থী হিসেবে বিবেচনা করে। ২০২১ সালের ২৮আগস্ট পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দাতা সংস্থাকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ৮৯০,০০০ এর বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে (UNICEF,2021)। ২০১৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩ তম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া ভাষণ অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০১৭ সাল থেকে ১.১ মিলিয়ন রোহিঙ্গাকে খাদ্য, পানি, আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে (Lewis, 2018)। এটা স্থানিক জনগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের জন্য হুমকি ও বোঝা হয়ে দেখা দিয়েছে।

১.১.২ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু

রোহিঙ্গা হলো মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে একটি সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু (এথনিক মাইনোরিটি), ধর্মীয় সংখ্যালঘু (রিলিজিয়াজ মাইনোরিটি), এবং ভাষাতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু (লিঙ্গুইস্টিক মাইনোরিটি) (নাসির উদ্দিন, ২০১৭)। বর্তমান বিশ্বের আলোচিত ও ভাগ্য বিড়ম্বিত একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর নাম রোহিঙ্গা। মিয়ানমার সরকার তাদের মৌলিক মানবাধিকার ও নাগরিকত্ব অস্বীকার করে ১৯৪৮,১৯৫৫-১৯৫৯, ১৯৬৬, ১৯৬৭-১৯৬৮, ১৯৬৯-১৯৭১, ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৯১-১৯৯২ এবং ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে চলমান রোহিঙ্গা বিতাড়নের অভিযান চালায় (Ullah, 2011)। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় রোহিঙ্গারা আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে আসে। ২০১৭ সালের ২৫আগস্ট থেকে চলমান সামরিক অভিযানের কারনে ৭৪২,০০০ এর বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে (Fossvik, 2018;IOM, 2018; UNHCR)। ৩৪টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গত ৫ বছর যাবৎ প্রায় এক মিলিয়ন উদ্বাস্তু গাদাগাদি করে বসবাস করছে (JRP, 2020)। আজকের রাখাইন রাজ্য একসময় আরাকান নামে পরিচিত ছিল যার অংশ ছিল বৃহত্তর চট্টগ্রামের একাংশ, এবং ফেনী ও নোয়াখালীর একাংশ (Chowdhury, 2004; Karim, 2016)। তারও আগে এতদঞ্চল 'রোহান' নামে পরিচিত ছিল। আরব ভূগোলবিদ মো. রাশিদুজ্জামান ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দে অঞ্চলটিকে 'রোহান' নামে

অভিহিত করেন। ১৫৮৫ সালে ব্রিটিশ ট্রাভেলার রেলফ ফিচও এটাকে ‘রোহান’ নামে অভিহিত করেন (Siddiquee, 2012:16)। সাবেক এই ‘রোহান’ রাজ্যের অধিবাসীরাই মূলত রোয়াইঙ্গা বা রোহিঙ্গা জাতি (আখতারুজ্জামান, ২০০০; আখন্দ, ২০১৩; Chawdhury, 2004;Siddiqui, 2007; Siddiquee, 2012; Karim, 2016)। মিয়ানমার সরকার ও রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র দীর্ঘ বছর ধরে রোহিঙ্গাদেরক ‘বাঙ্গালি সন্ত্রাসী’ হিসেবে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, জবরদস্তি শ্রম, নিজস্ব ঘর-বাড়ী থেকে উচ্ছেদ, আগুন দিয়ে ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া, চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, শিক্ষা ও বিবাহে নিয়ন্ত্রন আরোপ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, মুক্তিপন ও চাঁদা আদায়, অপহরণ, লুন্ঠন, ধর্মীয় কাজে বাধাদান, ইতিহাস-ঐতিহ্য ধ্বংসসাধনসহ নানাবিধ প্রক্রিয়ায় দেশ থেকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করেছে (Mohajan, 2018)। দীর্ঘদিন অনবরত এবং অব্যহত মিথ্যাচার কোনো কোনো প্রোপাগান্ডাকে সত্য বানিয়ে দিতে পারে। এডওয়ার্ড হেরমান এবং নোয়াম চমস্কি এটাকে বলেছেন Manufacturing Consent যেখানে অত্যন্ত সুকৌশলে মিডিয়া এবং রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডা মেশিন পদ্ধতিগতভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিত্য মিথ্যাচারের মধ্য দিয়ে জনমনে একটি মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরের চেষ্টা করে (Herman and Chomsky, 1988)। আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিম ছাড়াও থান্তইক্যা, জেরবাদি, কামানচি প্রভৃতি মুসলমান জাতির বসবাস ছিল এবং এখনো আছে (আখন্দ, ২০১৩:১৩)।

১.১.৩ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা আগমনের ইতিহাস

রোহিঙ্গা মুসলমানগন কয়েকশত বছর ধরে মিয়ানমারে বসবাস করে আসছে এবং তারা একটি নৃগোষ্ঠী (Kipgen, 2013)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালের আগে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত আরাকানে রাখাইন এবং রোহিঙ্গারা একটি শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করে এসেছে। ১৭৮৪ সালে বার্মিজ রাজা বোধোপায়া আরাকান দখল করে নিলে রাখাইন এবং বার্মিজদের মধ্যে চরম বৈরিতার সৃস্টি হয়। ১৮২৬ সালে ব্রিটিশরা বার্মা দখল করে নিলে ক্রমান্বয়ে আরাকানের জাতিগত অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ব্রিটিশরা ‘ভাগ করো শাসন করো’ নীতি ও কৌশল আরাকানেও প্রয়োগ করে। রাখাইন আর রোহিঙ্গাদের মধ্যে ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়তে থাকে। দক্ষিণ আরাকানে ক্রমান্বয়ে রাখাইনরা আর উত্তর আরাকানে রোহিঙ্গারা বসতি গড়তে শুরু করে।

ব্রিটিশরা রাখাইনদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করতে থাকে আর রোহিঙ্গারা ব্রিটিশদের কিছুটা আনুকূল্য পায়। এরই সুদূরপ্রসারী ফল-১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জাপানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রোহিঙ্গারা ব্রিটিশদের পক্ষাবলম্বন করে (Mirco et al, 2017)। অন্যদিকে রাখাইনরা জাপানিদের পক্ষ নেয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে ব্রিটিশরা আরাকান থেকে পিছু হটে। এই সুযোগে জাপানিজ ফ্যাসিস্ট ও উগ্রপন্থী রাখাইনদের হাতে এক লাখ রোহিঙ্গা নিহত হয় এবং নিশ্চিহ্ন হয় তাদের ৩০৭টি গ্রাম (ইসলাম, ২০২০:১৪)।

এই ধ্বংসযজ্ঞের কবলে পড়ে প্রায় আশি হাজার রোহিঙ্গা পালিয়ে ব্রিটিশ বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে আশ্রয় নেয়। পরে ব্রিটিশরা আরাকান পুনর্দখল করে এবং রোহিঙ্গাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে উত্তর আরাকানে তাদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান-ভারত স্বাধীনতার প্রাক্কালে রোহিঙ্গারা পাকিস্তানে যোগদানের তৎপরতা চালায় যা বার্মিজরা কখনো সুনজরে দেখেনি। এমন এক প্রেক্ষাপটে ১৯৪৮ সালে বার্মা ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে যেখানে রোহিঙ্গাদের কোনো মৌলিক মানবাধিকার ও নাগরিকত্বের স্বীকৃতি ছিল না(Akhter et al, 2014)।

১৯৫০ সালে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। প্রধানমন্ত্রী উ নু রোহিঙ্গাদের স্বীকৃতি দেন এবং ১৯৫১ সালে বার্মার সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দলের হয়ে ৫ জন রোহিঙ্গা পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয় (Constantine, 2012)। প্রধানমন্ত্রী উ নু'র শাসনাধীনে ১৯৫৭ সালে বার্মায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রোহিঙ্গাদের জাতীয় পরিচয় পত্র দেয়া হয় এবং এই নির্বাচনে প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে সাতটি আসনে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয় (Yegar, 1972:133-135। ১৯৬০ সালের নির্বাচনে উ নু পুনরায় বিজয়ী হয়ে বার্মা ফেডারেশনের অধীনে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি উত্তর আরাকানের রোহিঙ্গা প্রধান অঞ্চল নিয়ে Mayu Frontier Administration গঠন করে এ অঞ্চলকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসেন এবং রোহিঙ্গাদের বার্মার একটি বুনিয়াদি জাতি হিসেবে অভিহিত করেন (The Pakistan Times, 27th

August1959)। আরাকানের মগ গোষ্ঠীর নির্যাতন থেকে রোহিঙ্গাদের রক্ষা করার জন্য সরকারের এ উদ্যোগকে রোহিঙ্গারা স্বাগত জানায়।

রোহিঙ্গারা তাদের নেতা রবিউল্লাহর নেতৃত্বে স্বতন্ত্র আবাসূমির দাবিতে বার্মিজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত হয়। ব্যর্থ হয়ে রোহিঙ্গা স্বশস্ত্র বিদ্রোহীরা প্রধানমন্ত্রী উ নু'র আহবানে ১৯৬১ সালের ৪জুলাই বার্মিজ সেনাবাহিনীর উপসেনাপ্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অং গুইয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে (The Pakistan Times, 27th August1959)। আত্মসমর্পণের সময় রোহিঙ্গাদের সমান অধিকার, নাগরিকত্ব ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা-সব স্বীকার করে নেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী উ নু বিদ্যমান সম্প্রদায়গত বৈষম্য সমাধানের লক্ষ্যে একটি ফেডারেল সম্মেলন আহবান করেরন। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নে উইন বর্মী জাতিগত অভিযানের প্রশ্নে কোনো ছাড় দিতে রাজী ছিলো না। ১৯৬২ সালের ২ মার্চ ফেডারেল সম্মেলন শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সেনাপ্রধান জেনারেল নে উইন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিলে রোহিঙ্গাদের জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ। এ দুর্ভোগ আর নিপীড়নের স্বরূপ এ রকম:

১. রোহিঙ্গাদের ভিনদেশী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।
২. তাদের নাগরিকত্ব ও ভোটের অধিকার হরণ করা হয়।
৩. শিক্ষা, চিকিৎসা, চলাচলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।
৪. সব ধরনের মানবাধিকার থেকে তারাবঞ্চিত হয় ।
৫. সর্বশেষ তাদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

জেনারেল নে উইন সামরিক অফিসার এবং বর্মী সিভিলিয়ান নিয়ে Burma Socialist Programme Party(BSPP) গঠন করে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। রোহিঙ্গারা নবগঠিত BSPP তে যোগ না দিলেও আরাকানের মগরা তাতে ব্যাপকভাবে যোগদান করে (Yunus, 1994:153-154)। জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রোহিঙ্গা নির্মূলের জন্য আরাকানী মগদের উস্কিয়ে দেন এবং 'বার্মানাইজেশন পলিসি' গ্রহণ করে জমি,শিক্ষা, বানিজ্য, ব্যবসায় ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা জাতীয়করন করেন (Devi:2014)। রোহিঙ্গা বিতাড়নের প্রক্রিয়া বহুবার বহুভাবে হয়েছে, কখনো অপারেশন সাগামিন, কখনো অপারেশন ক্লিনজ,

কখনো অন্য নামে। এই বিতাড়নের আয়োজন সম্পন্ন করতে চালানো হয়েছে গনহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুন্ঠন ইত্যাদি। মিয়ানমার সামরিক সরকার রোহিঙ্গাদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী হিসেবে আখ্যায়িত করে সকল প্রকার মৌলিক মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে (Azad et al, 2013)। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না (Akhter et al, 2014)। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে তারা আত্মপরিচয়ের জন্য সংগ্রাম করে আসছে এবং নিজেদেরকে Northern Rakhine State (NRS) এর বাসিন্দা বলে দাবি করে আসছে (Azad et al, 2013)।

১৯৬৪ সালে রোহিঙ্গাদের United Rohingya Organisation, The Rohingya Students Association, Rangoon University Rohingya Students Association, Rohingya Jamiatul Ulama, Arakan National Muslim Organisation, Arakan Muslim Youth Organisation এবং Rohingya Student Association প্রভৃতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করে (Yunus, 1994:153-154) এবং Burma Broadcasting Service (BBS) থেকে নিয়মিতভাবে রোহিঙ্গা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে দেয়। নে উইন ক্ষমতা গ্রহণের পর আর কোনো মুসলমানকে মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূত করা হয়নি এবং তিনি আরাকানের প্রশাসনকে বৌদ্ধকরণ করে অনেক মুসলমান পুলিশ অফিসারকে বার্মার দূর্গম এলাকায় বদলী করেন এবং অনেককে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেন। সামরিক বাহিনী থেকে সকল মুসলিম অফিসার ও জোয়ানদের চাকরিচ্যুত করেন। ১৯৬৪ সালের ১৭ মে ৫০ও ১০০ টাকার মুদ্রামূল্য রহিত করা হলে আরাকানী রোহিঙ্গারা ব্যাপকভাবে কক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরাকানী মগরা জমাকৃত অর্থের মূল্যমান নতুন টাকা ফেরত পেলেও রোহিঙ্গারা তাদের জমাকৃত টাকা ফেরত পায়নি। পক্ষন্তরে সকল ব্যবসা-বানিজ্য ও রেশন বিতরনের সার্বিক তদারকি মগদের হাতে থাকায় মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে (Census of India, 1931)। ১৯৬৭ সালে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে রোহিঙ্গাদের মজুতকৃত খাদ্যশস্য জোর পূর্বক আদায় করে আরাকান থেকে রেঙ্গুনে পাঠানো হয়।

১৯৬৬ সালে সামরিক বাহিনী ‘শিউ কাই’ ও ‘কাই গান’ অপারেশনের নামে হত্যা, মহিলাদের শ্লীলতাহানি, সম্পদ লুট, এবং বিনা কারণে কারাগারে নিক্ষেপ প্রভৃতি নির্যাতনের মুখে টিকতে না পেরে Kyawktaw, Mrohaung, Pauktaw, Minbya প্রভৃতি অঞ্চলের অসংখ্য রোহিঙ্গা নিজেদের বাড়িঘর, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রেখে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নেয় (দৈনিক সংগ্রাম, ১৯৯১)।

১৯৭৪ সালে ইউনিয়ন চুক্তি স্বাক্ষরের সময় রোহিঙ্গাদের কোনো প্রতিনিধিকে ডাকা হয়নি। এর ফরে তারা আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও অধিকার আদায়ের জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেয় (Murshid, 2017)। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসক নে উইন এর শাসনামলে রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীকে নির্মূলের জন্য নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হয় (Akhter & Kusakabe, 2014)।

১৯৭৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অপারেশন ‘কিং ড্রাগন’ বা ‘নাগামিন’ শুরু হয়। এই অপারেশনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা এবং তাদের আদমশুমারি থেকে বাদ দেওয়া। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ জুলাই ১৯৭৮ পর্যন্ত পরিচালিত এই অপারেশনের ফলে প্রায় ৩০০,০০০ রোহিঙ্গা নাফ নদী পাড়ি দিয়ে কক্সবাজারে আশ্রয় নেয় (Ahmed, 2010)। ৩১ জুলাই ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে এক সমঝোতার বলে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গা তাদের নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে যায়।

১৯৮২ সালে ‘মিয়ানমার নাগরিকত্ব আইন’ পাস হয় যেখানে তিন ধরনের নাগরিকত্বকে স্বীকার করে নেয়: নাগরিক, সহযোগী নাগরিক এবং নিরপেক্ষ নাগরিক। এই আইনে বার্মার ১৩৫টি জাতিগোষ্ঠীকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় কিন্তু বৈধ অধিবাসী এবং আরাকানের আদি বাসিন্দাদের একটি জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি (Ahmed, 2010; Parnini, 2012)। ফলে রোহিঙ্গা পেট্রিয়টিক ফ্রন্ট (আরপিএফ) কর্তৃক নতুন দল হিসেবে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) তৈরি হয়। ১৯৮৬ সালে রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) উপ-দলসমূহ মিলে আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট

(এআরআইএফ) গঠন করে। নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে তাদেরকে রাষ্ট্রহীন করা হয় এবং ১৯৮৮ সালে State Law and Order Restoration Council (SLORC) এর মাধ্যমে মুসলিম রোহিঙ্গাদের মালিকানাধীন জমি কেড়ে নেয়া হয়। ১৯৮৯ সালে State Law and Order Restoration Council (SLORC) সামরিক আইন জারি করে মানবাধিকারকর্মীসহ হাজারের অধিক লোককে গ্রেপ্তার করে এবং বার্মার নতুন নামকরণ করা হয় 'মিয়ানমার'। যার রাজধানী রেঙ্গুন থেকে ইয়াঙ্গুন করা হয়। ১৯৯১ সালে সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজারের অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। তাদের মতে, মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক তারা নির্বিচার হত্যা, জোরপূর্বক শ্রম, ধর্ষণ এবং ধর্মান্তরের শিকার হন। ১৯৯২ সালে রেঙ্গুনকে UNHCR এর সাথে একটি সমঝোতা করতে বাধ্য করা হয় এবং বাংলাদেশে আসা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে সম্মত করানো হয়। ১৯৯২-২০০৪ সালের মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৩৬ হাজার রোহিঙ্গাকে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় পুনর্বাসিত করা হয়। ২০১২ সালে রাখাইন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করা হয়। ২৮ মে,২০১২ রাম্রি টাউনশিপে ১৬ বছরের এক রাখাইন তরুণী তিন রোহিঙ্গার ধর্ষণের শিকার এবং নিহত হওয়ার খবরে পুরো রাখাইন অঞ্চলে জাতিগত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সত্য ঘটনা ছিল, ২৬ বছর বয়সের ওই রাখাইন তরুণীকে জনৈক রাখাইন তার দুই রোহিঙ্গা বন্ধুর সহায়তায় ধর্ষণের পর হত্যা করে। ৩জুন রাম্রির দক্ষিণ-পূর্বে থংগোতে যাত্রীদের চলন্ত বাস থামিয়ে তিন শতাধিক রাখাইন জনতা বাসে থাকা ১০ রোহিঙ্গা মুসলিমকে পিটিয়ে হত্যা করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের প্রতিবেদনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতাকে অমানবিক ও চরম নৃশংসতাপূর্ণ বলে উল্লেখ করে (ইসলাম, ২০২০:৬১) । ২০১৩ সালের মার্চ মাসে বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যে আন্ত:সাম্প্রদায়িক সহিংসতা মিকটিলা শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশ কয়েকটি অঞ্চলে তা বিস্তৃতি লাভ করে। প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন মিকটিলায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। UNHCR এর মতে, রোহিঙ্গা ও অন্য মুসলমানরা আরাকান রাজ্যে নিপীড়ন ও সহিংসতা অব্যাহত থাকার কারণে নৌকায় মিয়ানমার থেকে পালিয়ে যায়। ২০১১ সালের জুন থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ৫৫ হাজার এবং জানুয়ারি থেকে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত আরো ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ নৌকায় পালিয়ে গেছে (উদ্দিন, ২০১৭:২৪২)। ২০১৫ সালে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা

কর্তৃক শনাক্তকরণ কার্ড ('সাদা কার্ড') অবৈধ ঘোষণা করে, তাদের নাগরিকত্বের জন্য 'বাঙ্গালি' হিসেবে আবেদন করতে বাধ্য করে এবং তাদের বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসনের কথা উল্লেখ করে।

অক্টোবর ২০১৬ সালে মিয়ানমার পুলিশ দাবি করেছে যে, তিনটি সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে শত শত ইসলামি জঙ্গি হামলা চালিয়ে নয়জন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছে। পুলিশের ভাষ্যমতে হামলাকারীরা Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) এর সদস্য। ARSA উক্ত হামলার বিষয়টি অস্বীকার করলেও মিয়ানমার সামরিক বাহিনী উত্তর আরাকান অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে রোহিঙ্গাদের নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ করে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৪৬,০০০ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে।

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গাদের উপর নেমে আসে মহাবিপর্যয়। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে গঠিত হয় রাখাইন অ্যাডভাইজরি কমিশন। ২০১৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অং সান সু চির আগ্রহে এবং অনুরোধে কফি আনান ফাউন্ডেশনের মধ্যে বোঝাপড়ার সূত্রে এই কমিটি গঠিত হয়। কমিটি রাখাইন স্টেটে স্থায়ী শান্তি আনতে রোহিঙ্গা সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে মিয়ানমার সরকারকে পরামর্শ দেবে, তথা সুপারিশ করবে। 'টুওয়ার্ডস আ পিসফুল, ফেয়ার অ্যান্ড প্রসফরাস ফিউচার ফর দ্যা পিপল অব রাখাইন' শিরোনামের ৬৫ পৃষ্ঠার এই প্রাথমিক রিপোর্টের পূর্ণাঙ্গ রূপ মিয়ানমার সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা অং সান সু চির কাছে ২৫ আগস্ট ২০১৭ নেপিডোতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কফি আনান হস্তান্তর করেন (ইসলাম, ২০২০:৮৫)। এই রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হলো:

১. অবিলম্বে রোহিঙ্গাদের তাদের স্বদেশে ফেরত নিতে হবে।
২. রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব প্রধান করতে হবে।
৩. রোহিঙ্গাদের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনর্নির্মান করে দিতে হবে।
৪. মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ১ লাখ ২০ হাজার রোহিঙ্গা মানবেতর জীবন যাপন করছে, তাদেরও নিজ নিজ বসতভিটায় ফেরত যাওয়ার ব্যাবস্থা করা উচিত।

৫. রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের অন্যান্য নাগরিকের মতোই সব নাগরিক অধিকার ভোগ করতে দেয়া উচিত।

৬. সরকার ইচ্ছা করলে কমিশনের সুপারিশসমুহ এখনই কার্যকর করতে পারে। এতে সু চির রাখাইন অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে।

৭. রাখাইনের প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গার অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনে অপ্রীতিকর যেকোনো পরিস্থিতি পরিহারে রাখাইন এবং রোহিঙ্গাদের সব আন্দেলনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে।

৮. কমিশন সেনাবাহিনী এবং পুলিশ কর্তৃক হত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির ওপর স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠনেরও সুপারিশ করছে।

৯. আগামী এক বছরের মধ্যে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য কমিশন মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

কফি আনান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর আরাকন রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি বা ARSA নামক রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের একটি গ্রুপ ৩০টি থানায় এবং একটি সামরিক চৌকিতে হামলা চালিয়ে ১২জনকে হত্যা করেছে দাবি করে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ২৫ আগস্ট, ২০১৭ রাখাইন রাজ্যজুড়ে ‘অপারেশন ক্লিয়ারেন্স’ নামে জেনোসাইট চালায় যা মিয়ানমারে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে (উদ্দিন, ২০১৭:২৪৫)। রোহিঙ্গা নিধন অপারেশনে সামরিক বাহিনীর সাথে উগ্রপন্থী বৌদ্ধরাও যোগ দিয়েছে। তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, নির্বিচারে গনহত্যা চালিয়েছে, তাদের পাশবিক নির্যাতনে রেহাই পায়নি নারী ও শিশুরাও। খুন, ধর্ষণ, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগের হাত থেকে বাঁচতে প্রতিদিন হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীর ঢল নামে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে। প্রথমদিকে সীমান্ত বন্ধ রাখলেও পরে মানবিক দিক বিবেচনায় নিয়ে সবগুলো বর্ডার খুলে দেয় বাংলাদেশ সরকার। বর্তমানে টেকনাফের বালুখালী, কুতুপালং ইত্যাদি ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গার সংখ্যা ১১ লাখ (ইসলাম, ২০২০:১৫)। এই মানবিক সংকট তৈরির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে (Karim, 2017)। আরাকানে রয়েছে প্রচুর পাকৃতিক সম্পদ। কাঠ, কৃষি, সুপেয় পানির পাশাপাশি রয়েছে প্রচুর খনিজ সম্পদ, যা সম্প্রতি আবিস্কৃত হয়েছে। সামরিক সরকার ও অফিসার এবং বহুজাতিক কোম্পানী

মিলে এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ উত্তোলন করতে চায়। ২০১২ সালে মিয়ানমার সরকার ভূমি আইন পাশ করে। এই আইনের বলে সরকার 'প্রাকৃতিক সম্পদ' আহরনের নামে রোহিঙ্গাদের ভূমি অধিগ্রহণ করেছে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে (উদ্দিন, ২০১৮:২৩৩)। আর এভাবে পরিকল্পিতভাবে আরাকানের রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

১.২ সমস্যার বিবরণ

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ২০২২ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। দুর্নীতি ও মৌলবাদের ঝুঁকির পাশাপাশি ২০১৭ সালের ২৫আগস্ট থেকে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাদের আগমনের ফলে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। রোহিঙ্গা সংকট মিয়ানমারের অভ্যন্তরীন সমস্যা হলেও বর্তমানে এটা বৈশ্বিক সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। বৈশ্বিক পর্যায়ে রোহিঙ্গা সংকটের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হলো বাংলাদেশ। Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) এর ব্যানারে সামরিক চৌকি ও পুলিশ স্টেশনে বিদ্রোহীদের হামলা এবং কতিপয় পুলিশ সদস্য নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনী 'অপারেশন ক্লিয়ারেন্স' নামে রোহিঙ্গা বিতাড়নের অভিযান চালিয়ে তাদের ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ,ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতন, সম্পদ ধ্বংস ও ভয়-ভীতি দেখায়। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল Andrew Gilmour সামরিক বাহিনীর এসব কর্মকান্ডকে 'এথনিক ক্লিনজিং' এবং 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন (UN News, 2018)। এর ফলে বাংলাদেশ,পাকিস্তান,সৌদি আরব,মালয়েশিয়া,ভারত,সংযুক্ত আরব আমিরাত,থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় রোহিঙ্গারা আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে আসে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে যার বেশিরভাগই এসেছে সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানের কারনে (UNHCR)। জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী ২০১৭ সালের ২৫আগস্ট থেকে ২৩সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাড়ে চার লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সামরিক বাহিনী, বর্ডার পুলিশ এবং স্থানীয় বৌদ্ধ উগ্রবাদী গোষ্ঠীর হামলার কারনে ৬৮৮,০০০ রোহিঙ্গা আরাকানের উত্তরাঞ্চল থেকে পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে (Fossvik, 2018)। এ বিতাড়ন

প্রক্রিয়া বহুবার বহুভাবে হয়েছে, কখনো অপারেশন নাগামিন, কখনো অপারেশন ক্লিনজ, কখনো অন্য নামে। মিয়নমার সরকার ১৯৪৮, ১৯৫৫-১৯৫৯, ১৯৬৬, ১৯৬৭-১৯৬৮, ১৯৬৯-১৯৭১, ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৯২ সালেও অভিযানের নামে রোহিঙ্গাদের বাস্তুচ্যুত ও দেশছাড়া করেছে। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানকারী দেশ হিসেবে বর্তমানে আঞ্চলিক, বৈশ্বিক নানামুখী সমস্যার মুখোমুখি। স্থানিক জনগোষ্ঠী ও সরকার মানবিক বিবেচনায় তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং UNHCR এর সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় চাহিদার যোগান দিয়ে যাচেছ (Datta, 2015)।

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ, উখিয়া এবং রামু উপজেলায় রোহিঙ্গাদের জন্য তৈরী ক্যাম্পগুলো অবস্থিত। স্থানিক জনগোষ্ঠীর উপর রোহিঙ্গা ক্যাম্প স্থাপনের ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত এবং নিরাপত্তা প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য কক্সবাজার জেলার ভৌগোলিক ও জীবনযাত্রার তথ্য জানা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কক্সবাজার হলো জেলা শহর ও প্রধান পর্যটন কেন্দ্র যেখানে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত (মানচিত্র-১)। কক্সবাজার জেলার মোট আয়তন ২৪৯১.৮৬ বর্গ কিলোমিটার যা পাহাড়, নদী, সমুদ্র, অরন্য, উপত্যকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্যান্য জেলা থেকে স্বতন্ত্র (Lewis, 2018)। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বংশে ২০°৩৫' থেকে ২১°৫৬' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৫০' থেকে ৯২°২৩' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ জুড়ে কক্সবাজার জেলার অবস্থান। এ জেলার উত্তরে চট্টগ্রাম জেলা, পূর্বে বান্দরবান জেলা, নাফ নদী ও মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।

উপকূলবর্তী হওয়ায় এ জেলা প্রায়ই সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, হারিকেন, সাইক্লোন ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয় (বাংলাপিডিয়া-২০১৪)। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৩৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন ১১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩,৩৭৮ মিলিমিটার। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার উপস্থিতির কারনে এই অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন, মাটির ক্ষয়, বন উজাড়সহ নানাবিধ চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে । স্থানীয়

অর্থনীতি মূলত পর্যটন, মৎস্য আহরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল (Lewis, 2018)।

চিত্র-১: কক্সবাজার জেলার মানচিত্র (সূত্র: বাংলাপিডিয়া)

জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ৪৯.৮৪%, অকৃষি শ্রমিক ৭.৯২%, শিল্প ১.০৪%, ব্যবসা ১৭.৩৯%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ২.৫৬%, নির্মান ১.১৯%, ধর্মীয় সেবা ০.২৭%, চাকরি ৫.৯৬%, রেন্ট এন্ড রেমিটেন্স ১.৮৪% এবং অন্যান্য ১১.৯৯%

(বাংলাপিডিয়া, ২০১৪)। জনসংখ্যার বেশিরভাগ বাঙালি মুসলিম;এছাড়া হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে। ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা জনস্রোতের পর কক্সবাজারের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুন হয়েছে যা ভৌগোলিক ভারসাম্য নষ্ট করেছে। কক্সবাজার অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের উপস্থিতির কারনে বনভূমি ধ্বংস,মাটি দূষণ ও ক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে (Lewis,2018)।

রোহিঙ্গা সমস্যা ২০১৭ সালে শুরু হয়েছে এমনটি নয়। এটা বিগত পাঁচ দশক আগে থেকে মিয়ানমার সরকার কর্তৃক সৃষ্ট মিয়ানমারের অভ্যন্তরিন সংকট। দুই লাখের অধিক সংখ্যক রোহিঙ্গা ইতোমধ্যে কক্সবাজারের বিভিন্ন উপজেলায় ক্যাম্পে বা ক্যাম্পের বাইরে অবস্থান করছে (Myat, 2018)। ১৯৯৮ সালে দুই দেশের সরকার আলোচনা করে কোনো ফলপ্রসু সমাধানে আসতে পারে নাই। দিন দিন পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে এবং বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর যথাযথ পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছে।

এছাড়া এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রোহিঙ্গারা ক্যাম্পগুলোতে মানবেতর জীবন যাপন করছে এবং তাদের সামনে কোনো ভবিষ্যত নেই। দূর্ভাগ্য আর নির্মমতার চরম শিকার হয়ে তারা নিজের দেশে অবাঞ্ছিত, ডিঙ্গিতে পাড়ি দিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। রোহিঙ্গাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ২ এপ্রিল ২০১৯ ওয়াশিংটনের উইড্রো উইলসন সেন্টারের সহকারী পরিচালক মাইকেল কুগেলমান বলেন “রোহিঙ্গারা হলো বিশ্বের বিষন্নতম মানুষ, তাদের কথা আমরা এখন ভুলতে বসেছি (দৈনিক প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০১৯, হাসান ফেরদৌস ‘পৃথিবীর নি:সঙ্গতম উদ্বাস্তু-রোহিঙ্গা’)। অস্বাভাবিক সংখ্যক রোহিঙ্গা উপস্থিতি এবং সম্পদের অপর্যাপ্ততা স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে এবং জনজীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে।

৩১ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫৯৭,০০০ রোহিঙ্গা কুতুপালং বর্ধিত অংশে এবং প্রায় ২৩৭,০০০ রোহিঙ্গা অন্যান্য ক্যাম্প ও সেটেলমেন্টে আশ্রয় নিয়েছে (ISCG,2020a)। নতুন আসা উদ্বাস্তুদের চাপে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ক্যাম্পগুলোতে ঘনত্ব বেড়ে গেছে। রোহিঙ্গারা গাদাগাদি করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবন যাপন করছে (Milton et. al, 2017)। খাদ্য সংকট,বিশুদ্ধ পানির অভাব, চলাচলে বাধা এবং নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

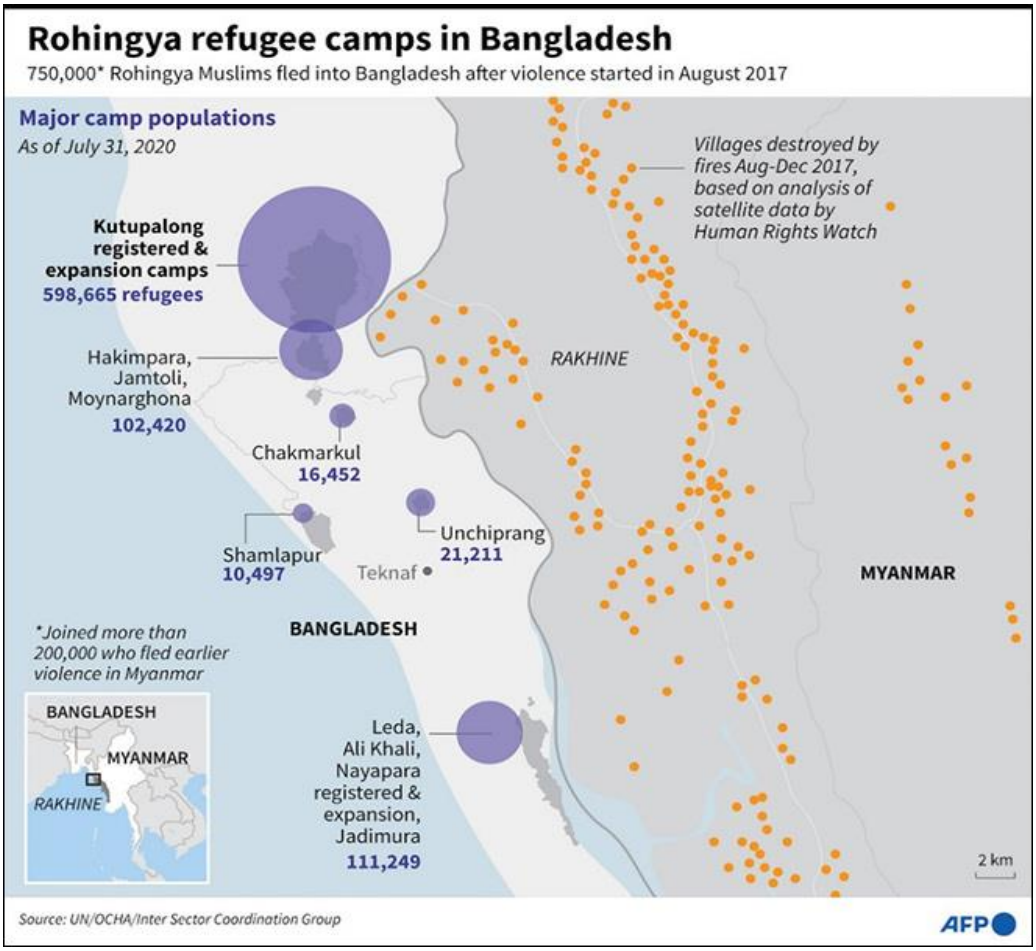

চিত্র-২: রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোর অবস্থান এবং ২৫ আগস্ট ২০১৭ সাল পরবর্তি সময়ে মিয়ানমার থেকে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা (সূত্র: এএফপি, ২০২০)।

রোহিঙ্গাদের ভঙ্গুর মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টিহীনতা এবং নিজেদের কমিউনিটির দ্বারা যৌন নির্যাতনের মতো সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে (Milton et. al, 2017)।

সর্বোপরি ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করার কারনে জনস্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য হুমকির মধ্যে পড়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দেশি বিদেশী পর্যবেক্ষকগন উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন চাহিদাকে মাথায় রেখে কাজ করলেও স্থানিক জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও চাহিদার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে (Gomez et. al, 2010)। কোনো একটি কমিউনিটির মাঝে উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন এনজিও ও সাহায্য সংস্থাগুলো আক্রান্ত এলাকায় সাহায্য হিসেবে বিপুল পরিমান সম্পদ জড়ো করেন, বিতরন করেন যা স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারনে স্থানীয় পর্যায়ে অন্তনৈতিক উন্নয়ন ঘটে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ঘটে (Khatun, 2017)। অন্যদিকে নেতিবাচক প্রভাবগুলো স্থানিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত ক্ষতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে (Alam, 2018a)। মানবিক বিবেচনায় টেকনাফ ও উখিয়ার যে পাহাড়গুলোতে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে সেখানে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সুপেয় পানি ও শৌচাগার সুবিধা ছাড়া লাখ লাখ মানুষ গাদাগাদি করে পলিঠিনের ছাউনি দেওয়া ঝুপড়িতে ভেজা মাটির ওপর বসবাস করছে। অন্যদিকে তাদের আশ্রয় দিতে গিয়ে এই পাহাড়গুলোর সবুজ আচ্ছাদন উজাড় করে ফেলা হয়েছে। রোহিঙ্গারা জ্বালানির উপকরণ সংগ্রহের জন্য আশেপাশের পাহাড়ের গাছপালা কাটতে বাধ্য হয়েছে। সরকারি বনবিভাগের হিসাবে ইতোমধ্যে ৩ হাজার ৮৭৫ একর পাহাড়ে রোহিঙ্গা বসতি স্থাপিত হয়েছে। আরো ২ হাজার একরে তাদের বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে বেসরকারি হিসাবে কক্সবাজার জেলার পাহাড়, পতিত জমি, মেরিন ড্রাইভের পাশের খোলা জায়গামিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার একর জায়গায় রোহিঙ্গা বসতি ছড়িয়ে পড়েছে (উদ্দিন, জামাল, ২০১৮:২২৩১)। পুরাতন আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সরকারি নিবন্ধিত আশ্রয়কেন্দ্র দুটি। কেবল এই দুটি আশ্রয়কেন্দ্রে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (UNHCR) তালিকাভূক্ত রোহিঙ্গারা জনপ্রতি মাসিক ৭ শত টাকার খাদ্যসামগ্রী পেয়ে থাকে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (WFP) এর

তরফ থেকে। পুরানো ৫ কেন্দ্রের প্রায় ২ লাখ রোহিঙ্গার মধ্যে ৩৪ হাজার ৮৭৪ জন রোহিঙ্গা বিদেশী ত্রান পায়। অবশিষ্ট ১ লাখ ৬৫ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশের শ্রমবাজারে আয়-রোজগারেরর ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তারা সাগরে মাছ ধরা এবং স্থল বন্দর, ইটভাটা ও কৃষি জমিতে দিনমজুরের কাজ করে। আবার অনেকে পান-সুপারি, শুটকি মাছ,শাঁক- সবজি বিক্রি ও রিক্সা চালায় এবং ফেরি করে বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র বিক্রি করে। রোহিঙ্গাদের অনেকে আবার টেকনাফের ইয়াবা চোরা চালানি চক্রের হয়ে কাজ করে, এমন অভিযোগ রয়েছে। আইনত জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া মুঠোফোনের সিমকার্ড ক্রয় করা যায় না। বিভিন্ন সময়ে আগত রোহিঙ্গারা দিব্যি মুঠোফোনের সিম ব্যবহার করে কথা বলছে (**উদ্দিন, জামাল,** ২০১৮:২৩)। রোহিঙ্গারা স্থানীয় শ্রমিকদের চেয়ে কম পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করেন বিধায় স্থানীয় জনগনের আয় কমে গেছে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেছে (Khatun, 2017:24)। খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান, জ্বালানি, বিশুদ্ধ পানি ও শৌচাগার সংকট ছাড়াও রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু কেন্দ্রিক আরো বহুমুখি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। উদ্বাস্তু শিবিরগুলো বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশনের আওতায় এসেছে, তবে বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় ছড়িয়ে থাকা উদ্বাস্তুদের যথাযথ হিসাব রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মিয়ানমারের প্রতিবেশী দেশ হিসেবে সম্পূর্ণ মানবিক দিক বিবেচনা করে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুকে আশয় দিয়েছে। আশ্রয়স্থল কক্সবাজার একটি দরিদ্রতা ও বন্যা কবলিত জেলা। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুকে দীর্ঘদিন ব্যবস্থাপনা করা অত্যন্ত দুরূহ। স্থানীক জনগোষ্ঠী এই সংকটের সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত অংশীজন। তাদের জনজীবনে এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়।আলোচ্য গবেষণায় স্থানিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি ও প্রভাব বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় সংকট নিরসন ও মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা অব্যহত রেখেছে।

কক্সবাজারের স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য রোহিঙ্গা ও স্থানিক জনগোষ্ঠীর মাঝে শান্তিপূর্ণ ও টেকসই সহাবস্থান অপরিহার্য । বিগত কয়েক দশক যাবত রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করে আসছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী অস্থায়ী ছাউনিতে বসবাস করছে। মিয়ানমার- বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে উদ্বাস্তু প্রত্যর্পণ বিষয়ে খুব একটা অগ্রগতি লক্ষ করা যায় নি। এর জন্য মূলত মিয়ানমার সরকারের অনীহাকে দায়ী করা হয়।

মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিম রাখাইন প্রদেশের রোচহঙ্গারা একটি স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী। ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রেক্ষিতে তারা আলাদা (Milton et al, 2017:6; Shams, 2015)। ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সাথে কিছুটা মিল থাকলেও রোহিঙ্গারা নিজেদেরকে বাঙ্গালি বলে মনে করে না (Albert, 2017; Siddique, 2012)। স্থানিক বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী মানবিক কারনে সহানুভূতি দেখিয়ে তাদের গ্রহণ করেছে এবং সরকার তাদের প্রতি মৌলিক চাহিদা পূরনে UNHCR এর সহযোগিতায় সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন (Datta, 2015:134-135)।

১.৩ গবেষণার তাৎপর্য

রোহিঙ্গা সংকট মিয়ানমারের অভ্যন্তরীন সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রোহিঙ্গা একটি ভাষাভিত্তিক জিাতির নাম। আরাকানে বসবাসকারী রোহিঙ্গারাই এ ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চলীয় চিটাগনিয়ানদের ডায়ালেক্টস এর সাথে রোহিঙ্গাদের ভাষার কিছুটা মিল আছে। বাংলাদেশ সরকার ও স্থানিক জনগোষ্ঠী মানবিক কারনে রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং বিগত পাঁচ দশক যাবত আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানকারী দেশ হিসেবে বর্তমানে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট তুলে ধরেছেন যে, রোহিঙ্গা সমস্যার সম্মানজনক, নিরাপদ ও টেকসই সমাধান না হলে তা এ অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দিবে। মিয়ানমারের

অসহযোগিতা ও গড়িমসির কারনে ক্রমান্বয়ে রোহিঙ্গা সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক বহুপাক্ষিক সমস্যায় পরিনত হতে চলেছে।

ভূ-কৌশল, ভূ-রাজনীতি, ভূ-অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় রোহিঙ্গা সংকটকে ধীরে ধীরে আলোচনার পাদপ্রদীপে নিয়ে এসেছে। সমস্যা সমাধানে মিয়ানমার কোনো ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ না করায় রোহিঙ্গা সংকট প্রলম্বিত হলে সেটা শুধু আঞ্চলিক নয়, বৈশ্বিক সংঘাতে রূপ নিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মিয়ানমারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে নিষ্ক্রিয়তা বিষয়টিকে ক্রমস জটিল করে তুলেছে। মিয়ানমারের উদ্যোগহীনতার পিছনে সেদেশের অভ্যন্তরীন ক্ষমতা কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা মতো বিষয়গুলো জড়িয়ে গেছে। যতদিন পর্যন্ত রোহিঙ্গা সংকটের আশানুরুপ সমাধান না হয় ততদিন পর্যন্ত কক্সবাজারের স্থানিক জনজীবনে এটার যে সকল প্রভাব পড়েছে তা বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা বিচার করাই আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

এটি একটি গুনগত গবেষণা। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো রোহিঙ্গা উপস্থিতির কারনে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব পর্যালোচনা করা। বর্তমান গবেষণার আরো যে সব বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলো হলো:

১। রোহিঙ্গা উপস্থিতির কারনে কক্সবাজার জেলার স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা;

২। রোহিঙ্গা উপস্থিতির কারনে কক্সবাজারের পরিবেশগত প্রভাব পর্যালোচনা করা; এবং

৩। রোহিঙ্গা সংকটের কারনে কক্সবাজারের স্থানিক জনজীবনের ওপর নিরাপত্তা ঝুঁকির প্রভাব অনুসন্ধান করা।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি মূলত একটি তথ্য উদঘাটনকারী ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমিক যেমন: জার্নাল আর্টিকেল,

বই, সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট, সংবাদপত্র রিপোর্ট, বিভিন্ন ওয়েবসাইট, পলিসি রিপোর্ট এবংঅন্যান্য অপ্রকাশিত গ্রন্থ, থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে ।

১.৬ গবেষণার অধ্যায় বিন্যাস

এই গবেষণাপত্রটি সাতটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ভূমিকা যেখানে রোহিঙ্গা সংকটের প্রেক্ষাপট, সমস্যার বিবরণ, গবেষণার গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে সাহিত্য পর্যালোচনা ও কক্সবাজারে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর অন্তঃপ্রবাহ সম্পর্কিত আলোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে রোহিঙ্গাদের এথনিক পরিচিতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘন এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর রোহিঙ্গা উপস্থিতির প্রভাব আলোচিত হয়েছে। সংকট উত্তরনে পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়ে উপসংহার ও সুপারিশমালা আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারনাগত কাঠামো এবং সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১ ভূমিকা

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় বিষয়বস্তুর ধারণা গঠনের মাধ্যমে গবেষণার যৌক্তিকতা তৈরি হয় (Radhakrishna, Yoder & Ewing, 2007)। পরস্পর সম্পর্কিত ধারণাসমূহ বা ধারণাগত কাঠামো গবেষণার মৌলিক ব্যাখ্যা ও উপসংহার তৈরি করে দেয় (Berman, 2013:2)। এটা গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, গবেষণার প্রশ্নমালা উন্নতকরণ, সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন এবং সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণে সাহায্য করে (Lederman & lederman, 2015:597; Le Compte and Goetze,1993)।

Creswell (2013) মনে করেন যে,সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণা কাঠামোকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। এখানে গবেষণকর্মটির অধ্যায়গুলোর সূচনায় রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার সজ্ঞায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে রিফিউজি ক্রাইসিস বিষয়ের উপর সাহিত্য পর্যালোচনা করে ধারনাগত কাঠামোর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও জনগোষ্ঠীর উপরে আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত এবং নিরাপত্তাজনিত প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকার ও স্থানিক জনগোষ্ঠীর উপর যে প্রভাব রিফিউজির মাধ্যমে তৈরী হয় তা খুঁজে বের করতে ধারনাগত কাঠামো ও সাহিত্য পর্যালোচনা সহায়তা করে (Levy & Ellis, 2006)।

২.২ প্রায়োগিক সংজ্ঞা/ প্রামান্য সংজ্ঞা:

২.২.১ রিফিউজি/ উদ্বাস্তু:

উদ্বাস্তু হচ্ছে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি যারা তার বা তাদের দেশ থেকে নিপীড়িন, যুদ্ধ বা হিংস্রতার দরুন জোড়পূর্বক বিতাড়িত হয়েছে। একজন উদ্বাস্তুর মধ্যে জাতিগত, ধর্মগত, জাতীয়তা বা রাজনৈতিক অথবা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় নিপীড়নজনিত ভীতি ভালোভাবেই লক্ষ করা যায়। খুব সম্ভবত তারা ভীতির কারনে নিজ দেশে ফিরে আসতে পারে না। যুদ্ধ ও জাতিগত নিধন, উপজাতীয় এবং ধর্মীয়

সহিংসতা হচ্ছে উদ্বাস্ত তৈরী হওয়ার অন্যতম প্রধান কারনসমূহ। যার ফলে এক অঞ্চলের মানুষ অন্য দেশ বা জাতির কাছে উদ্বাস্তু হিসেবে যেতে বাধ্য হয়। **মানব্য** স্থানান্তরের অন্যতম নিত্যনৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উদ্বাস্তু সমস্যা। জাতিসংঘের ১৯৫১ সালের কনভেনশন এবং ১৯৬৭ সালের প্রটোকল উদ্বাস্তুকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে যে, নিপীড়ন,সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং সুরক্ষার অভাবে কোনো ব্যক্তি যদি তার নিজ দেশের সীমানার বাইরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে, তাহলে তাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয় (UNHCR, 2018)। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্র এবং ইউএনএইচসিআর প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির উদ্বাস্তু মর্যাদা নির্ধারন করে (George, 2009:34)। মাঝে মাঝে উদ্বাস্তু মানুষ স্থায়ীভাবে উদ্বাস্তুতে পরিনত হয় কারন তারা নিজ দেশে প্রতিহিংসামূলক নিপীড়নের ভয়ে ফিরে যেতে ভয় পায়। আবার তারা অস্থায়ী বসবাসরত রাষ্ট্রেও নাগরিকত্ব পায় না। কেননা উদ্বাস্তু হিসেবে এসে কোনো দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের বিধি-বিধান রয়েছে।

ঐতিহাসিক Joseph Reese Strayer বলেন, “একজন মানুষ যৌক্তিক কারনে তার সারাজীবন পরিবারহীন,স্থায়ী নিবাস ব্যতীত,অথবা ধর্মীয় অন্তর্ভূক্তি ব্যতীত থাকতে পারে। কিন্তু যদি তিনি হন রাষ্ট্রহীন,তাহলে তিনি কিছুই নন। তার নেই কোনো অধিকার, নিরাপত্তা অথবা সামান্য পরিমান সুযোগ সুবিধা” (The Lancet, 2016:217)। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান বলেন, “একজন ব্যক্তির পক্ষে এটি অনুধাবন করা সম্ভব নয় যিনি তার দেশ থেকে জোরপূর্বক উদ্বাস্তু হিসেবে বিতাড়িত হন নি” (Ullah, 2011)।

২.২.২ গ্রহণকারী জনগোষ্ঠী/ স্থানিক জনগোষ্ঠী

Vas Dev (2002) বলেন, “গ্রহণকারী জনগোষ্ঠী হচ্ছে কোনো স্বাধীন দেশে বসবাসরত সেই জনগোষ্ঠী যারা নিজেদের পছন্দে বা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে হোক; একটি ভূমি ও রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীকে স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য বসবাসের জায়গা করে দেয়”।

ARRA (Administration for Refugee and Return Affairs-Ethiopia) এর মতে, স্থানিক জনগোষ্ঠী হচ্ছে সেই জনগোষ্ঠী যারা উদ্বাস্তুদেরকে

স্বাগত জানায়, আত্মীয়তার সম্পর্কের ন্যায় বসবাস করে একই সাথে উদ্বাস্তুদের অধিকার রক্ষা করে এবং তাদের সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ ভাগাভাগি করে(ARRA, 2011:34)।

কিন্তু যাই হোক না কেন, বাস্তবিক অর্থে গ্রহণকারী জনগন ও উদ্বাস্তুদের মাঝে নেতিবাচক মনোভাব দেখা দেয় এবং স্থানিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ তৈরী হয়। কেননা উদ্বাস্তুদের জন্য স্থানিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিকক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা বিষয়ে হুমকি তৈরী হয় (Vas Dev, 2002:4)।

২.২.৩ উদ্বাস্তু এবং অভিবাসীর মধ্যে পার্থক্য

একজন ব্যক্তি বিভিন্ন কারনে অথবা অবস্থার প্রেক্ষাপটে একদেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দিতে পারেন। সাধারনত অভিবাসী তখনই হবে, যখন একজন মানুষ অর্থনৈতিক কারনে বা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত এবং রাজনেতিক কারনে দেশান্তরিত হবেন (Parkins, 2011:12)। অনেক সময় মানুষকে ধর্মীয়, জাতিগত সংঘাত, যুদ্ধ বা দারিদ্র্যের কারনে অভিবাসী হতে বাধ্য করা হয় (Grinvald, 2010:17)।

মাঝে মাঝে উদ্বাস্তু এবং অভিবাসীকে একত্র বা একই বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে দুটি বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও কারন বিদ্যমান। ২০১৮ সালে UNHCR এভাবে মন্তব্য করে যে, উদ্বাস্তু হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তার নিজ দেশ থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত হন নিপীড়ন,যুদ্ধ অথবা হিংস্রতার জন্য । একজন উদ্বাস্তুর মধ্যে ভালোভাবেই নিপীড়নের ভয় খুঁজে পাওয়া যায় তার গোত্র,বর্ণ,ধর্ম,জাতীয়তা,রাজনৈতিক মতামত অথবা কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায়। তারা তাদের নিজ বাড়ীতে ফিরে যেতে পারে না, তাদের এই নিপীড়নজনিত ভীতির কারনে।

একজন মানুষ উন্নত জীবন-যাপনের জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়, উদাহরনস্বরূপ এভাবে বলা যায় যে, চাকরির সুবিধা বা উন্নত জীবন ব্যবস্থার আকাঙ্খা ইত্যাদি কারনে স্থানান্তরিত হলে তাকে অভিবাসী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় (Sengupta, 2015)।

এভাবে পার্থক্য করার মাধ্যমে বর্তমানে বিশ্বের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী উদ্বাস্তু হিসেবে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে রাষ্ট্রহীন হয়ে জীবনযাপন করছে। পক্ষান্তরে অভিবাসী তার নিজ ইচ্ছায় উন্নত জীবনের লক্ষ্যে অন্য দেশে পাড়ি জমায়। সুতরাং দুটি বিষয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

২.২.৪ স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর উদ্বাস্তুর বোঝা এবং কল্যাণ/সুবিধাসূহ

উদ্বাস্তুর উপস্থিতি অবশ্যই স্থানিক জনগোষ্ঠীর উপর বোঝাস্বরূপ, কিন্তু একইসাথে এতে তাদের কিছু সুবিধাও রয়েছে। উদ্বাস্তুদের উপস্থিতিতে সেখানে মানবিক সহায়তা পৌছে যায় যেখানে উদ্বাস্তুদের পাশাপাশি স্থানিক জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু সেবা পরিচালিত হয়। যেখানে অন্যরা তাদের মৌলিক অধিকারের খোঁজ করে সেখানে স্থানিক জনগোষ্ঠীর সদস্যরা অতিরিক্ত অংশ পেয়ে থাকে (Whitaker, 2002:339) । উদাহরণস্বরূপ, উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত দ্রব্যাদির চাহিদার জন্য স্থানীয় পন্যের দাম বেড়ে যায়, ফলে স্থানীয়দের একটি অংশ লাভবান হয় (Madanat, 2013:03)।

২.২.৫ আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু আইন ও নীতি

আমার গবেষণাকর্মটিতে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের বিষয়ে যে আইন ও নীতি নিয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হবে তা বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষনা-১৯৫১, জেনেভা উদ্বাস্তু কনভেনশন এবং এর ১৯৬৭ সালের প্রটোকল ও প্রাসঙ্গিক নীতি ও আইনের আলোকেই হবে।

জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের সাধারণ সভায় গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় (UDHR) অনুচ্ছেদ ১৪(১) এ নির্ধারিত করে বলা হয় যে, প্রত্যেক নিপীড়িত মানুষের অন্য দেশে বসতি ও শান্তির উদ্দেশ্যে গমনের অধিকার রয়েছে। এই মৌলিক অধিকার নিপীড়িত সকল ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার।

১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশন ও ১৯৬৭ সালের প্রটোকল উদ্বাস্তু সম্পর্কে এভাবে মতামত ব্যক্ত করে যে, উদ্বাস্তুদের জন্য উদ্বাস্তু গ্রহণকারী রাষ্ট্র UNHCR এর সাথে

একত্রে উদ্বাস্তুদের নিয়ে কাজ করবে এবং তাদের দায়িত্ব নিবে (Jastram & Achiron, 2001)।

উদ্বাস্তুদের জন্য এবং যারা বসতির জন্য দেশান্তরিত তাদেরকে অত্যাচার এবং অমানবিক আচরণ থেকে রক্ষা করার জন্য ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক কনভেনশনে বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের অনুচ্ছেদ '৭' কে রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করা হয় (European Union Agency for Fundamental Rights, 2016)।

১৯৫১ সালের সম্মেলনের অনুচ্ছেদ ৩৩(১) এ বলা হয়েছে যে, উদ্বাস্তুরা জীবনের ভয়, জাতীয়তার হুমকি, ধর্মের ভিত্তিতে, জাতিগত ভিন্নতা অথবা কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় যে দেশে আশ্রয় নিবে সে দেশ তাদেরকে জোরপূর্বক নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে পারবে না। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট হিসেবে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে বাধ্য এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখতে হবে (Mohammed, 2011; UNHCR, 1992)।

২.২.৬ দেশের নাগরিক এবং উদ্বাস্তুদের অধিকারের অসামঞ্জস্যতা

২০০৩ সালে UNHCR রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে বলে যে, তারা মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা, এবং মিয়ানমারের নাগরিকত্বহীন, তাদেরকে ক্ষমতাহীন করা হয়েছে, একই সাথে তাদেরকে রাষ্ট্রহীনে পরিনত করা হয়েছে (UNHCR, 2003)। মানবিক দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু আইনানুসারে অধিকার নিশ্চিতকরণপূর্বক নিজ দেশের অভ্যন্তরে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে দেশের সরকার উদ্বাস্তুদেরকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে বা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে অপারগ। যার ফলে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের ন্যায় রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারছে না। একই সাথে তাদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের স্বাধীনতা বা কর্মের স্বাধীনতা দিতে পারছে না (Imran & Mian, 2014a)। যুক্তির বিচারে একথা বোঝা যাচ্ছে যে, সরকার রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম না হওয়ায় স্থানিক জনগোষ্ঠীর উপর এর

প্রভাব অনুধাবন করতে পারে নি। ফলে এখন উদ্বাস্তুদের স্থানিক গোষ্ঠীর সাথে খাপ খাওয়াতে বেগ পেতে হচ্ছে (Martin, Margesson & Vaughn, 2017)।

২.৩ সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণার অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের অন্ত:প্রবাহ এবং স্থানিক জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্যাম্প নির্মানের কারনে সৃষ্ট প্রভাব এবং উদ্বাস্তুদের জন্য প্রাপ্ত সহায়তা ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ মূল্যায়ন করা। অসংখ্য কেস স্টাডির মাধ্যমে স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর উদ্বাস্তুদের অবস্থান ও প্রভাব অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে দেখে রোহিঙ্গা সংকটকে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছে।

Maysadt এবং Verwimp (2009:1-2) তাঁদের এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, একটি বৃহত্তর উদ্বাস্তু গোষ্ঠীর অন্ত:প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত প্রভাব তৈরী করে বা বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে। গবেষকগনের মতে, বাংলাদেশের যে অঞ্চলে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জন্য ক্যাম্প নির্মান করে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা একটি অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চল, যার অধিবাসীদের ইতোমধ্যেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। রোহিঙ্গা সংকট বর্তমানে তাদরে জীবনকে আরো চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে। Maysadt এবং Verwimp এভাবে উপসংহারে এসেছেন যে, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের এই ঢল স্থানিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের স্থায়িত্ব ও গুনগত মানের উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। এক দশক পূর্বে করা গবেষণায় তাঁরা নাটকীয়ভাবে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকটি অবলোকন করেন এবং সেইসাথে তাঁরা স্থানিক জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের উপর এর প্রভাব বৃদ্ধির বিষয়টি অনুধাবনে করেন।

২.৩.১ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী

মিয়ানমার সরকার রাখাইন প্রদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে অবৈধ অভিবাসী উল্লেখ করে তাদেরকে মৌলিক অধিকার, নাগরিক অধিকারসহ সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে (Azad & Jasmin, 2013:26)। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস এর ওপর বহু গবেষণা ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে (Ahmed, 2010; Alam, 2012; Brooten, 2015; Deppermann, 2013; Haque,

2016)। এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থগুলোতে মূলত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঐ অঞ্চলে উত্তরোত্তর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমস্যা উদ্ভূত হচ্ছে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ২৫ আগস্ট ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ আরাকান রোহিঙ্গা সলভেশন আর্মি (ARSA) ৩০ টির বেশি নিরাপত্তা বাহিনীর চৌকিতে স্বশস্ত্র হামলা পরিচালনা করে। কারন হিসেবে তাদের ওপর চালানো নির্যাতনকে উল্লেখ করে এর দায় স্বীকার করে। Medicins Sans Frontiers (MSF,2017) এর মতে, আরসা (ARSA) কর্তৃক পুলিশ পোস্টে আক্রমনের পরবর্তি পর্যায়ে মিয়ানমার সরকার কমপক্ষে ৬৭০০ রোহিঙ্গাকে হত্যা করে যাদের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী ৭৩০ জন শিশু রয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে, মিয়ানমার নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক বহু নারী ও মেয়ে ধর্ষিত এবং হত্যার শিকার হয়েছে।

মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা এই সংগঠনের মতে, ২০১৭ সালের এই হামলায় উত্তর আরাকানের কমপক্ষে ২৮৮ টি গ্রাম আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে (Amnesty International, 2018)। ২৫ আগস্ট ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ পরবর্তি সময়ে ৬৫৫,০০০ এর বেশি মানুষ বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিল। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের পূর্বে ৩০৭,৫০০ জনের অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বসবাস করে আসছিল। বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায় যে, মিয়ানমার সেনাবাহিনী জঘন্যভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, মানবতার বিরুদ্ধে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, গনহত্যা এবং জাতিগত নির্মূলে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে (Martin, Margesson & Vaughn, 2017:1-2)।

২.৩.২ স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর উদ্বাস্তু আগমনের প্রভাবসমূহ

গবেষণাকর্মটির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আগমনে যে প্রভাব কক্সবাজারের স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর পড়েছে তার মূল্যায়ন এবং এর প্রভাব পর্যালোচনা করা। এখানে প্রভাব অনেকাংশে নির্ভর করে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতির ধরন এবং উদ্বাস্তু ও স্থানীয়দের মধ্যকার আন্ত:সম্পর্কের ওপর (Maystadt & Verwimp, 2009:1-2)।

২.৩.২.১ উদ্বাস্তু আগমনে স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর আর্থ-সামাজিক প্রভাব

উদ্বাস্তু গ্রহণকারী রাষ্ট্র হিসেবে একটি দেশের ওপর অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্বাস্তুদের একটি ঢল চলে আসে যা আকস্মিকভাবে অর্থনৈতিক ও বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত ভঙ্গুরতা নিয়ে আসে। এর ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়ন শুরু হয় (Lee, 2005:74)। উদ্বাস্তুদের এই অন্ত:প্রবাহের বন্ধোবস্তে ঐতিহ্যগত যে স্থানিক সামাঞ্জস্যতা, জাতিভূক্তি, ধর্মীয়, সম্প্রদায়গত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং সামাজিক সেবার যে নিয়ম-কানুন তা সাংঘর্ষিক হয়ে উঠে (Betts, 2009:9)। উদ্বাস্তুদের উপস্থিতি স্থানিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের জন্য নিরাপত্তার চ্যলেঞ্জ তৈরী করে। এসময় চুরি, ডাকাতির ঘটনা বৃদ্ধি পায়, গুপ্তহত্যা, পতিতাবৃত্তি এবং মাদকের চোরাচালান ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পায় (Gomez & Christensen, 2010:11)।

Alix-Gracia এবং Saah(2009:166) এর লেখা একটি নিবন্ধে বিশ্বব্যাংকের অর্থনৈতিক রিভিউতে দেখানো হয় যে, উদ্বাস্তু আগমনে স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর অর্থনৈতিক প্রভাব ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুভাবেই পরিলক্ষিত হয়। স্থানিক জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরী হয়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে কিন্তু একইসাথে সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়ায়। যেমন: পানির স্তর নিচে নেমে যায়, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, বায়ুদূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রভাব স্থানিক জনগোষ্ঠীর জন্য হুমকি তৈরী করে। Kobia এবং Cranfield(2009:6) তাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, যদি উদ্বাস্তুরা বেকার হয়, তাহলে তারা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, আবার যদি তারা চাকরি পায়, তাহলে স্থানিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সংকুচিত করে। কেননা উদ্বাস্তুদের চেয়ে স্থানিক জনগোষ্ঠীকে বেশি পারিশ্রমিক দিতে হয়। এই উদ্ভূত জটিল সমস্যা নির্ভর করে উদ্বাস্তু গ্রহণকারী দেশের সামাজিক ধারনক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক উৎকর্ষতার ওপর, যেখানে সীমিত সম্পদের উপর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং চাকরির সুযোগ তৈরীতে দ্বন্দ্ব ও চাপ বৃদ্ধি পায়। (Deikun & Zetter,2010:6)।

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সংকট তৈরী এবং দেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্রে রোহিঙ্গা ক্যাম্প নির্মান করার ফলে ঐ এলাকার পাশাপাশি পার্শবর্তী পর্যটন কেন্দ্রগুলোর গুরুত্ব কমে আসছে। উদাহরণস্বরুপ বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজার এবং মিয়ানমারের সাথে লাগোয়া এলাকায় প্রতিষ্ঠিত অভিজাত হোটেলগুলোতে পর্যটকের সংকটকে উল্লেখ করা যায়। Maystadt এবং Verwimp, (2009:1)

দেখিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক কাঠামো, কৃষি ক্ষেত্র, স্থানীয় জীবনমান উদ্বাস্তুদের উপস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । বিশেষ করে, অধিক সংখ্যক উদ্বাস্তু হলে সেখানে শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিত্য পন্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। জাতিসংঘ (UN-HABITAT) ২০১৮ সালের মে মাসে ঘোষণা করে যে, এই সংগঠন ও অন্যান্য এনজিওগুলো সমন্বিতভাবে কক্সবাজারের স্থানীয় জীবনমান, স্থানীয় অর্থনীতি, চাকরির সুযোগ সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক প্রভাবকে মূল্যায়ন করবে। এভাবে জাতিসংঘ এবং UNHCR গুরুত্বের সাথে স্থানীক জনগোষ্ঠীর ওপর উদ্বাস্তুদের প্রভাব বিবেচনায় রাখছে।

Sattar, (2017) দেখান যে, বাংলাদেশ সরকার দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের পর্যটন খাতকে সম্প্রসারন এবং ঐ অঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণে কক্সবাজার থেকে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে উদ্যত হয়েছে, যাতে পর্যটন খাতের উন্নয়ন সম্ভব হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থ । তবুও UNHCR উদ্বেগের সাথে নিশ্চিত হতে চাচ্ছে যে, সরকার যেখানে তাদেরকে নতুন করে স্থানান্তরিত করতে চায় সেখানে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা, স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণ এবং প্রস্তাবিত এলাকাটি নিরাপদ ও সহজে যাতায়াতযোগ্য কিনা।

বাংলাদেশ সরকার বঙ্গোপসাগরের ভাষানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করেছে । ইতিমধ্যে ১ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের অবস্থান তুলে ধরে বলেন যে, রোহিঙ্গাদের কক্সবাজারের ক্যাম্পগুলো উপর অতিরিক্ত চাপ কমাতে এবং এনজিও কর্মী ও সহায়তাকারী সংগঠনের সদস্যদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে অস্থায়ীভাবে ব্যবস্থা করা হবে।কেননা বিপুল পর্যটন সম্ভাবনাময় কক্সবাজারের হোটেল-মোটেলগুলোর উপর সহায়তাকারী সংগঠনের সদস্যদের চাপ বাড়তেছিলো। ফলে সেখানকার পর্যটন গুরুত্ব দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে (Sen, 2017)। Cookson(2017b) বলেন, কক্সবাজারে সহায়তাকারী সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পর্যটন অর্থনীতির উপর প্রবল ধাক্কা দেয়। কিন্তু তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য সৃষ্ট সমস্যার প্রভাব ও ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে সরাসরি কোনো উত্তর দেননি। প্রাথমিকভাবে আলোচ্য বিষয় সম্পৃক্ত রচনাসমূহ আন্তর্জাতিক মহলের মাধ্যমে হয়েছে এবং তারা মূলত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের বিশাল এই প্রবাহকে এবং চ্যালেঞ্জ এর উপরে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে কতিপয় গবেষক একটু এগিয়ে এসে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে

সমস্যা সমাধানে পরামর্শ প্রদান করেছেন।কিন্তু উদ্ভূত সমস্যার প্রকৃত সমাধানের জন্য কোনো বাস্তবিক সমাধান দেননি। ফলে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের কোনো স্পষ্ট পথ বা লক্ষ্য ধোয়শাই থেকে গেছে।

২.৩.২.২ সামাজিক প্রভাব হিসাবে সহিংসতা

যায়। Akhter এবং Kusakabe, (2014:225-226) একটি গবেষণায় দেখান যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারনে কক্সবাজার অঞ্চলে লিঙ্গাভিত্তিক নির্যাতন এবং সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্বাস্তু হিসেবে কর্মসংস্থান খোঁজ করায় তাদের কোনো অধিকার নেই। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন এনজিওগুলো প্রদত্ত যে সহায়তা তা রোহিঙ্গাদের চাহিদার তুলনায় খুবই নগন্য এবং অপর্যাপ্ত। এই বাস্তব পরিস্থিতি রোহিঙ্গাদেরকে যে কোনো উপায়ে জীবন-যাপনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখানে নীতি নৈতিকতার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার মতো অবস্থা তাদের নেই। ফলে তারা যে কোনো কাজ করতে দ্বিধা করছে না যা সামাজিক অবক্ষয় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে। আইনের মাধ্যমে পুরুষ সদস্যদের ক্যাম্পের বাইরে যাতায়াত সীমিত করে রাখা হয়েছে। তাই নারী সদস্যরা জীবিকার তাগিদে ক্যাম্পের বাইরে বের হচেছ। কেননা পূর্বের ইতিহাস বিবেচনায় সরকার ও দাতা গোষ্ঠীকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।

অবস্থা এমন হয়েছে যে, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নারীরা ঘরে ও বাহিরে সহিংসতার স্বীকার হচ্ছে। তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে প্রায়ই হুমকিতে থাকতে হয়। তাছাড়া মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের প্রধান পুরুষ এবং পুরুষের আধিপত্য রোহিঙ্গা সমাজে সর্বোচ্চ যার ফলাফল হলো সমাজে নারীর অবস্থানের অবনমন এবং সামাজিকভাবে নারী পুরুষের অবস্থানে অসমতা সৃষ্টি (Akhter & Kusakabe, (2014:230)। বহু গবেষক ও লেখক রোহিঙ্গা সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য এবং হিংস্রতা কারন খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন যা তাদের প্রজন্মন্তরে বয়ে চলছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে ভয়াবহ নৃশংসতা চালানো হয়েছে এবং তার প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে বিরাজমান। মৌলবাদী ও অন্ধ বিশ্বাসী হওয়ায় রোহিঙ্গা সমাজ ব্যবস্থা আরো শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে Akhter এবং (Cookson,2017b;Fair & Oldixon 2015:5)।

সুতরাং এই চারিত্রিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কারনে রোহিঙ্গারা যে কোনো সময় বিভিন্ন স্বশস্ত্র সামরিক গোষ্ঠী যেমন: RSO (Rohingya Solidarity Organisation) ,আলকায়েদা,জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (JMB) বা হরকাতুল জিহাদ আল ইসলাম(HUJI) এর মতো বয়াবহ ও দুর্ধর্ষ জঙ্গী সংগঠনে যোগ দিতে পারে যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ (Wolf, 2014:4)। নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী স্বল্প সময়েই প্রচলিত আইনি ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিভিন্ন অনৈতিক কাজ যেমন : চুরি, ডাকাতি, মাদকের চোরাচালান প্রভৃতি কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে যা স্থানিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি ও দু:চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে(Wolf 2014:5)। ইতোমধ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর হিংস্র মনোভাব ও মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে স্থানীক রাজনীতিবিদ ও অসাদুচক্র তাদের অনৈতিক ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে যুক্ত করার চেষ্টা করছে। এধরনের কর্মকান্ড স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মারাত্মক হুমকি বহন করছে(Jamy & Islam, 2015:93)। ইতোমধ্যে রোহিঙ্গাদের অনেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশী পাসপোর্ট ও জন্মসনদ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে কাজের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বহু অপরাধমূলক কাজের সাথে রোহিঙ্গাদের নাম বিভিন্ন রিপোর্ট ও সংবাদপত্রে প্রকাশ পাচ্ছে যা তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কর্মরত অবস্থায় করছে। এর ফলে বাংলাদেশের যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রয়েছে তা আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে(Imran & Mian, 2014:238)।

২.৩.৩ উদ্বাস্তু আগমন এবং উপস্থিতির রাজনৈতিক প্রভাব

উদ্বাস্তু আগমনের কারনে কোনো দেশের উপর যে সকল প্রভাব পড়ে তার মধ্যে অন্যতম হলো রাজনৈতিক প্রভাব। উদ্বাস্তু সংক্রান্ত অধিকাংশ গবেষণায় একথা উঠে এসেছে যে, নিরাপত্তাজনিত এবং রাজনৈতিক প্রভাব স্থানিক সমাজ ও সরকার ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি। উদ্বাস্তুর সাথে রাজনৈতিক কারন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত (Gomez & Christensen, 2010:13)। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহের সাথে উদ্বাস্তু নেতৃবৃন্দের সুসম্পর্ক বা ভিন্নরূপ সম্পর্ক তৈরী হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। এক্ষেত্রে তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তৈরীতে সরকারগুলোকে সহায়তা করতে পারে (Omeokachie, 2013:43)। বাংলাদেশ সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে সরকারের রাজনৈতিক প্রভাব বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন ধর্মীয় চরমপন্থী

সংগঠনে যোগদান যেমন: ইসলামিক স্টেট বা অন্যান্য জঙ্গী সংগঠনের প্রচেষ্টার বিষয়টি তুলে ধরেন (Das, 2018)। তাছাড়া স্থানিক জনগোষ্ঠীর সাথে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন স্বার্থ কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তৈরী হয় যা স্থানিক জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীন ঐক্য ও শান্তির স্থায়ীত্বকে হুমকিতে ফেলে দেয় (Lee, 2005:76)।

২.৩.৪ উদ্বাস্তুর উপস্থিতিতে স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর পরিবেশগত প্রভাব

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আরো একটি সীমাবদ্ধতা হলো তাদের ক্যাম্পগুলো বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তারা বসবাসের জন্য বাড়ি নির্মান এবং জ্বালানি চাহিদা মেটাতে ক্যাম্প এলাকার আশেপাশের সংরক্ষিত বনভূমি উজাড় করছে। মূলত কক্সবাজারের সবগুলো রোহিঙ্গা ক্যাম্পই বাংলাদেশের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে হওয়ায় দ্রুত বন উজাড় হচ্ছে (Tani et al, 2014:25-27)। বর্তমান সময়ে অতিরিক্ত সংখ্যক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর ঢল বিদ্যমান ক্যাম্পগুলোতে থাকার জায়গা দিতে পারছে না। যার ফলে অতিরিক্ত উদ্বাস্তুর চাপে ক্যাম্পগুলো বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। তাছাড়া পানি দূষণ, বন উজাড়করন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অতিব্যবহার স্থানিক জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবন যাপনকে ব্যাহত করছে (Datta, 2015:143)।

ধারন ক্ষমতার অতিরিক্ত উদ্বাস্তুতে ঠাসা ক্যাম্পগুলোতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে বিভিন্ন জটিল রোগ ও ভাইরাস ছড়াচ্ছে। যেমন: দূরারোগ্য HIV, ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিসমূহ দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে, যা উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি স্থানিক জনগোষ্ঠীকেও আক্রান্ত করছে (Atim, 2013:6)। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে,(২০১১) টেকনাফ বন্যপ্রাণি আশ্রয়কেন্দ্রের আওতায় প্রায় ১১,৬১৫ একর জায়গা অভয়ারন্য হিসেবে সংরক্ষিত ছিলো। কিন্তু অতিমাত্রায় রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আগমন,আবাসনের ব্যবস্থা ও স্থানিক জনগোষ্ঠীর অধিক হারে ব্যবহারের ফলে বন্য এলাকার বিস্তৃতি কমে (১৯৮৯-২০০৯) বর্তমানে ৪৫% এ এসে দাড়িয়েছে (Asik & Masakazu, 2017:230)।

উপরন্তু ঐ অঞ্চলে দশকের পর দশক ধরে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের অবস্থানের ফলে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশের ওপর স্থায়ীভাবে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা স্থানীয় থেকে শুরু করে সমগ্র অঞ্চলেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে (Omekachi, 2013:46; Rahman, 2010:237)।

২.৩.৫ নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ

রোহিঙ্গা সংকট কেবল মানবিক কারনে বিচার্য নয়, এই সমস্যা বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক সংহতির জন্যও হুমকিস্বরূপ। রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতির ওপর বোঝা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ইউরোপের উদ্বাস্তু সমস্যা আর রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। জাতিসংঘের মতে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জাতিগত নিধনের স্বীকার (Khan, 2017)।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রূপান্তরকারী রাষ্ট্র হিসেবে জনবহুল বাংলাদেশের ওপর এই সমস্যা অতিরিক্ত বোঝাস্বরূপ। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। ব্যাপক সংখ্যক বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী দেশের নিজস্ব ধারন ক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত চাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে যা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারন হিসেবে বিবেচিত।

২.৪ উপসংহার

দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা দৃশ্যমান যে, বহু লেখনীর মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের আগমনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব প্রমানিত সত্য। অনেক গবেষণায় এই মানবিক সংকটকে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ করা যায়, যেখান থেকে সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে কার্যকরী কিছু পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ দেখা যায়নি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের কাজের মাধ্যমে সংকট সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে।

রোহিঙ্গা সমস্যা এখন আর কোনো স্বাভাবিক সমস্যা নয় বরং এটি বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য দীর্ঘকালীন জটিল সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সুতরাং এই গবেষণায় কোনো সিদ্ধান্তে আসা খুবই কঠিন হবে। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ও কক্সবাজারের স্থানিক জনগোষ্ঠীর সকল দিক বিবেচনা করে একটি কার্যকরী সমাধানে পৌছাতে হবে যা বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গা উভয়ের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

তৃতীয় অধ্যায়

রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস এবং বাংলাদেশে আগমন

৩.১ ইতিহাস ও পটভূমি

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি বা আদিবাস মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলে। আরাকানে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় সপ্তদশ শতাব্দি থেকে বসবাস করছে, এরকম তথ্য প্রমান পাওয়া যায়। তাদের পূর্ব পুরুষেরা এসেছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে, যেমন: আরব, মুর,পাঠান,মুঘল,মধ্য এশিয়ান এবং ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জাতি থেকে। তারা কয়েক শতাব্দিতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চলে মিলিত হয়ে নতুন জনগোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে (Walton & Hayward, 2014)। বর্তমান রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও তারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং ইসলামী সংস্কুতি, প্রথা-পদ্ধতি, এমনকি আরবি নাম রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

কতিপয় জাতিতাত্ত্বিক, নৃবিজ্ঞানী এবং ভাষাবিদ রোহিঙ্গাদেরকে বার্মার জাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত বলে গবেষণাপূর্বক মতামত দিয়েছেন। কিন্তু তার পরেও তাদের নাগরিকত্ব ও পরিচিতি নিয়ে বহু প্রশ্ন তৈরী হচ্ছে এবং তারা নিজ দেশে নাগরিকত্বহীন অবৈধ বসবাসকারী (Siddique, 2012)। এই অধ্যায়ে রোহিঙ্গা জাতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং পটভূমি উন্মোচনের প্রচেষ্টা করা হবে, যা সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের কারন উন্মোচন করবে এবং চলমান নিপীড়নের কারন অনুসন্ধান করবে। প্রথম অংশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোকপাত করা হবে এবং দ্বিতীয় অংশে আরাকান অঞ্চলে সংঘাত নির্মূলে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে মিয়ানমার সরকারের নীতিগত অবস্থান তুলে ধরা হবে। শেষাংশে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় যে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তার বাস্তবতা তুলে ধরা হবে।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায় শত শত বছর ধরে মিয়ানমারে বিশেষ করে রাখাইন স্টেটে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বসবাস করে আসছে, যা তাদের ঐ অঞ্চলে জাতিগত অবস্থানের প্রমান বহন করে (Kipgen, 2013:300)। কিন্তু ১৯৪৮ সালে গ্রেট ব্রিটেন থেকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে মিয়ানমার সর্বজন স্বীকৃত

রোহিঙ্গা জাতিকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে মেনে নিচ্ছে না। দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের যে মৌলিক নাগরিক অধিকার রয়েছে, তা অস্বীকার করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসবাস করে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মিয়ানমারে অবস্থান একটি বিতর্কিত বিষয় হিসাবে দাড়িয়েছে এবং দেশের সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করছে। তারা রাখাইন প্রদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করছে। মিয়ানমার সামরিক সরকার ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রচার করছে যে, রোহিঙ্গারা মূলত পার্শবর্তী দেশ, বিশেষ করে মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চল এবং ভারতবর্ষের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল যা ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল এবং বর্তমানে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে মিয়ানমারে গিয়ে অভিবাসী হয়েছে। তারা আরো অভিযোগ করে যে, ইংরেজ ঔপনিবেসিক সরকারের সহযোগিতায় ও ছত্রছায়ায় রোহিঙ্গারা রাখাইন অঞ্চলে চলে যায়। ঐতিহাসিকভাবে মিয়ানমারে বসবাসরত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা মুসলমান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধদের মধ্যে দাঙ্গা-সংঘাত সংঘটিত হয়ে আসছে। সমস্যাপূর্ণ এই সংঘাত প্রায়শই ঘটে থাকে।

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি ও মৌলিক অধিকারকে রাজনীতিকরন করা হয় এবং একপাক্ষিকভাবে রোহিঙ্গাদেরকে অবমূল্যায়ন করা হয়। যেখানে আরাকানরা নিজেদেরকে ‘রোহিঙ্গা’ হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে সেখানে বৌদ্ধ অধিবাসীরা তাদেরকে ‘রাখাইন’ হিসেবে চিহ্নিত করছে। এভাবে রোহিঙ্গা জাতিকে অস্বীকার করা হচ্ছে (Siddique, 2012)। বার্মার স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই এই জাতিগত নিপীড়ন ও বৈষম্য চলে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আরাকান অঞ্চল জাপানি আর্মিদের দখলে চলে যায়। এ সময় বৌদ্ধরা জাপানিদের দোসর হিসেবে কাজ করে সম্মিলিতভাবে রোহিঙ্গা জাতির ওপর অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনে যোগ দেয়। জাপানিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বহু রোহিঙ্গা তৎকালীন মিত্রপক্ষের সাথে যোগ দেয় এবং জাপানিদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারে প্রতিরোধ গড়ে তোলে (Mirco, Goetz & Murage, 2017)।

রোহিঙ্গারা ব্রিটিশদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করায় তাদেরকে বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিরোধী ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এর ফলে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে মিয়ানমার সরকারের একটা স্থায়ী বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হয়। ১৯৪৮ সালে মিয়ানমার যখন ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা পেলো এবং স্বাধীন বার্মা আত্মপ্রকাশ করলো তখন

নতুন সরকার রোহিঙ্গা সংখ্যালঘু মুসলিমদের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব অব্যাহত রাখে (Wolf, 2017:8)। রোহিঙ্গারা যে আশায় ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে সে আশা অপূর্ণ রয়ে যায় যখন আরাকান স্টেটের স্বায়ত্তশাসন না দিয়ে বার্মাকে স্বাধীনতা দেয়া হয় (Abrar, 1996:3-5)।

১৯৫০ সালের দিকে বার্মায় রোহিঙ্গাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তারা ঘুরে দাঁড়ায়। বহু রাজনৈতিক নেতৃত্ব রোহিঙ্গাদেরকে তাদের দলে নেয় এবং তাদের মধ্যে অনেকেই আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন(Constantine, 2012;Devi, 2014:6)। ১৯৫১ সালে রোহিঙ্গাদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া হয় এবং তারা ভোটাধিকার পায়। ১৯৬০ সালে বার্মার সাধারণ নির্বাচনে রোহিঙ্গারা প্রত্যক্ষভাবে ভোট দেয়ে এবং নিজেরা নির্বাচনে প্রার্থী হয় (International Crisis Group, 2014:11)। কিন্তু দূর্ভাগ্যবসত যখন নে উনের (Ne Win) সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসলো তখন অবস্থা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হতে শুরু করে। ১৯৬২ সালে “বার্মাকরন নীতি” এর মাধ্যমে ভূমি, ব্যবসা-বানিজ্য, শিক্ষা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে জাতীয়করন করা হলো। এই নীতির মাধ্যমেই রোহিঙ্গা সংকটের সূচনা হয় (Devi, 2014:46)।

সরকারি নীতি হলো ছোট ছোট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকদেরকে যথাসম্ভব বলপ্রয়োগের মাধ্যমে হলেও “বৌদ্ধ বার্মিজ রাষ্ট্র” ব্যবস্থার ছায়াতলে আত্মীকরন করা হবে। তারা দেশব্যাপি জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলো (Ayako, 2014)। এর ফলে আরাকান অঞ্চলে বিবাদমান দুটি পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হলো এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলো (Shams, 2015)। জাতীয় সরকার প্রদেশের এই ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলো এবং তারা মুসলিম বিরোধীদের মদদ দিতে থাকে ও সহায়তা অব্যহত রাখে। এতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দূর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রায় দুই মিলিয়ন রোহিঙ্গা, যারা এক সময় মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে বসবাস করতো, তাদেরকে অবৈধ অভিবাসী ‘বাঙালি’ হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। এরপর থেকে রোহিঙ্গারা নিজ দেশে পরবাসী, নাগরিকত্বহীন, অযাচিত, রাষ্ট্রহীন জাতিতে পরিনত হয়।

৩.২ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পরিচিতি এবং চ্যালেঞ্জ

মিয়ানমার সরকার তাদের ১৩৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে রোহিঙ্গাকে অন্তর্ভূক্ত করেনি এবং তাদেরকে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে মেনে নেয় নি। কিন্তু রোহিঙ্গারা নিজেদেরকে দৃঢ়ভাবে আরাকান তথা মিয়ানমারের নাগরিক বিশ্বাস করে (Ayako, 2014; Parnini,2013a; Siddique,2012)। ১৯৩০ সালের দিকে রোহিঙ্গাদেরকে "বার্মার মূসলমান" হিসেবে চিহ্নিত করা হতো এবং তারা মুসলমান হিসেবে বার্মার নিজস্ব প্রথা-পদ্ধতি ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতো (Ayako, 2014:1-2)। এ সময় তারা মিয়ানমারের আদি অধিবাসী হিসেবে স্বীকৃত নাগরিক ছিলো। একইসাথে ঐ অঞ্চলে বসবাসরত অমুসলিমদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় ছিলো। বামার (Bamar) শব্দের মানে হচ্ছে বার্মার কর্তৃত্বকারী জাতিগোষ্ঠী। কিন্তু যখন বার্মিজ (Burmese) শব্দটি আসলো তখন বিষয়টি আরো স্পষ্ট হলো এবং সকল জাতিগোষ্ঠী নিজেদেরকে বার্মিজ হিসেবে পরিচয় মেনে নিলো যা বর্তমান মিয়ানমারের সকল নাগরিকের একক ও অভিন্ন জাতিসত্ত্বার পরিচায়ক। বর্তমান বহুজাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীও অন্তর্ভূক্ত। 'রোহিঙ্গা' শব্দটি রোহাং শব্দ থেকে এসেছে, যা রাখাইন প্রদেশের প্রথম পর্যায়ের নাম (Kipgen, 2013:300)। 'রোহিঙ্গা' শব্দ দ্বারা আরাকান প্রদেশে বসবাসরত সর্ববৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বুঝায়। যেখানে আরাকানে বসবাসরত বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদেরকে কালার (Kalar) বা বিদেশী এবং 'বাংলাদেশী' হিসেবে চিহ্নিত করছে।একইভাবে জাতীয় সরকার এটিকে সমর্থন দিচ্ছে (Karim, 2017)।

মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদেরকে 'রোহিঙ্গা' হিসেবে চিহ্নিত করা থেকে বা 'রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যবহারে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এমনকি তারা গনমাধ্যম ও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রকে 'রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করছে (Chambers, 2015; The Guardian, 2016)। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, জাতিগোষ্ঠী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচিতির নিমিত্তে 'রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যবহারকেই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছে। অনেক চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মনে করেন যে, মিয়ানমার সরকারের এই 'রোহিঙ্গা' শব্দটির অস্বীকৃতির মানে হলো ঐ অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের অবস্থানকে অস্বীকার করা এবং রাখাইন রাজ্যের সাথে তাদের ঐতিহাসিক মেলবন্ধন অবজ্ঞা করা। এভাবে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠকে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে জাতীয় মৌলিক অধিকার থেকে

বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে (Chambers,2015;Uddin,2015; Ventura, 2014:5-6)।

৩.৩ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি সামরিক সরকারের নীতিগত অবস্থান

১৯৭৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অংসান এবং অন্যান্য জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে চুক্তি হলো যে, তারা Unity in diversity অর্থাৎ 'ভিন্নতায় ঐক্য' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বার্মা ইউনিয়ন গঠন করবে, যা গনতান্ত্রিক মানসিকতা বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে (Ahmed, 2010:15)। কিন্তু এখানে মিয়ানমার সরকার ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক কেবল একটি গোষ্ঠী 'রোহিঙ্গা' কে এই তত্ত্বের মাধ্যমে বার্মা ইউনিয়নে নেয়া হলো না। ফলে সরকার তাদেরকে একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিলো। একই সাথে তারা অন্য সকল জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো (Murshid, 2017)।

মিয়ানমার সরকার ব্যবস্থায় ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সেনা সমর্থন ও অংশগ্রহণ পাকাপোক্ত হয় এবং ক্ষমতার এই কেন্দ্র থেকে তারা রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন ও অত্যাচারের মাত্রা এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যাতে এই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়ে (Akhter & Kusakabe, 2014:227)। মিয়ানমারে কিছু উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্ররোচনায় ১৯৭৮ সালে রোহিঙ্গা নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীর ওপর "Dragon King Operation" (Operation Nagamin) পরিচালনা করা হয়। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের হত্যা,নির্যাতন, লুন্ঠন ও ধর্ষণের শিকার হয়ে বা ভয়ে প্রায় তিন লক্ষ রোহিঙ্গা জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে (Constantine,2012)। মিয়ানমারে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। বাংলাদেশে অপ্রতিরোধ্যভাবে উদ্বাস্তুর ঢেউ আসতে শুরু করে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো তাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তিতে রাখাইন প্রদেশে অতিমাত্রায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরী হয় এবং তা রাখাইন প্রদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে আরো কঠিন করে তোলে।

১৯৮২ সালে মিয়ানমারের সর্বশেষ নাগরিক আইনে রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। একই নীতির কারনে তাদেরকে রাষ্ট্রহীন ভাসমান জনগোষ্ঠীতে

পরিনত করা হয় (Ahmed, 2010; Parnini, 2012:284)। এর ফলে রোহিঙ্গাদের কোনো সম্পত্তি থাকলো না, জমির ওপর কর্তৃত্ব হারালো এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় দশকের পর দশক আবদ্ধ করে রাখা হলো।

১৯৮৮ সালের State Law and Order Restoration Council(SLORC) রোহিঙ্গাদের ঘর-বাড়ির জায়গা দখল করে বেআইনিভাবে সামরিক স্থাপনা নির্মান করে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গাদের থাকার জন্য কোনো বসবাসের উপযুক্ত জায়গা দেওয়া হলো না। রোহিঙ্গারা সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাসের প্রায় অযোগ্য পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গা সম্প্রদায় উদ্বাস্তুতে পরিনত হয়। বার্মার পাহাড়ী অঞ্চলে তাদেরকে বসবাসের জন্য বাধ্য করা হয় এবং তারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে রোহিঙ্গাদের ওপর জুলুম, নির্যাতন শুরু হয়। নিপীড়ন, নির্যাতন, হত্যা,লুন্ঠণ ইত্যাদি কাজে মুসলিম বিদ্বেষী বৌদ্ধরা অংশ নেয়, যাদেরকে সহায়তা দেয় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা।

২০১৩ সালের দাঙ্গার সময়ে একটি মাদ্রাসার বর্ডিংয়ে বহু শিক্ষক-শিক্ষার্থীর লাশ পাওয়া যায় (ICG, 2013)। পরবর্তি বছরগুলোতে আরাকানে এরকম চিত্র নিয়মিত ঘটনায় পরিনত হয়। এমনকি বর্তমানেও এর বাইরে কিছু হচ্ছে না বরং পূনরাবৃত্তিই লক্ষনীয় (Akhter & Kusakabe, 2014:228)। বর্তমানে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় তাদের ওপর অত্যাচার, অন্যায়, জুলুমকে আর মুখ বুঝে সহ্য করছে না। তারা বরং নানা রকম সন্ত্রাসী বা প্রতিরোধমূলক কর্মকান্ডের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায় যে, ২৫ আগস্ট ২০১৭ সালে Arakann Rohingya Salvation Army(ARSA) মিয়ানমারের পুলিশ তল্লাশি চৌকিতে আক্রমন করে এবং উভয় পক্ষের যুদ্ধে প্রায় ১২ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়। এই আক্রমন ও অন্যান্য আক্রমনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংগঠনটি মূলত তাদের প্রতি সংঘটিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। তারা তাদের স্বশস্ত্র অবস্থানের জানান দিচ্ছে এসব আক্রমনের মাধ্যমে (Martin, Margesson & Vaughn, 2017)। ARSA কর্তৃক এসব আক্রমনের ফলে আন্তর্জাতিকভাবে রোহিঙ্গারা চাপে পড়েছে এবং মুসলিম বিদ্বেসী বিশ্ব ও জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধরা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর সুযোগ পেয়ে যায় (Walton & Hayward, 2014)।

২০১৫ সালে মিয়ানমারে যখন সেনা সমর্থিত সরকার থেকে গনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা হলো তখন রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। তাদের ন্যুনতম মানবাধিকারের পথ প্রশস্ত হবে এবং নিপীড়ন, নির্যাতন ও বৈষম্য দূর হবে, এমনটি ভাবতে থাকে। কিন্তু বাস্তবে এই আশা নিরাশায় পরিনত হয় এবং ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে স্মরণকালের ভয়াবহ মুসলিম বিদ্বেষী দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গায় ৬০০,০০০ রোহিঙ্গা জীবন বাঁচাতে উদ্বাস্তু হিসেবে বাংলাদেশের কক্সবাজারসহ বিশ্বের নানা দেশে পালিয়ে আসে (Martin, Margesson & Vaughn, 2017:1)।

৩.৪ মিয়ানমারের জাতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারন

রাখাইন অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘন কার্যক্রমকে মিয়ানমার সরকার ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় দশকের পর দশক প্ররোচিত করে আসছে। সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ধারা প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনী পুনরায় ক্ষমতা দখল করে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছে। এর ফলে সরকার ব্যবস্থায় অবশ্যম্ভাবী গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা ভেস্তে গেছে। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী মৌলবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সংকট তৈরীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে (Martin, Margesson & Vaughn, 2017; Gibbens, 2017)। বর্তমান সঙ্কট একটি জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এখানে কেবল ধর্মই একমাত্র কারন নয় বরং ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মাত্রা এর সাথে যুক্ত হয়ে সমস্যাটিকে স্থায়ীরূপ দিয়েছে (Walton & Hayward, 2014)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মিয়ানমারে বৌদ্ধদের ধর্মীয় বিশ্বাস সামরিক বাহিনী কর্তৃত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ‘৯৬৯’ নামক ধর্মীয় সংকেত এর মাধ্যমে মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব গড়ে তোলা হয়েছে। বৌদ্ধদের ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি অংশ হিসেবে ‘৯৬৯’ চিহ্নকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে ‘৯৬৯’ মানে The Three Jewels (Buddha, Dharma and Sangha) যাতে বৌদ্ধবাদের ধর্মীয় মূল ভাবনা নিহিত আছে। যেমন: শান্তি, পূণ্য, মানবিকতা, সাম্য ও আলোকসম্পাত এই ‘Three Jewels’ এর ‘৯৬৯’ কোডে নিহিত আছে (UNHCR, 2012)।

২০১২ সাল থেকে বৌদ্ধ সামরিক বাহিনীর সদস্যেদের মাধ্যমে ‘৯৬৯’ কোড এর অপব্যবহার শুরু হয়। বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বপক্ষে বিদ্বেষ ছড়ানো এবং

বৈষম্য সৃষ্টির জন্য এই চিহ্নের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। বৌদ্ধবাদের চরমপন্থায় রোহিঙ্গা মুসলমানরা প্রতিহিংসার শিকার হয় এবং তাদের মধ্যে ভয় ও ঘৃনা ছড়িয়ে পড়ে (Marshall, 2013)। '৯৬৯' ভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে ঘৃনা ছড়ানোর কারনে মানুষের মধ্যে দুশ্চিন্তা কাজ করে। বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে গণতান্ত্রিক পন্থায় যে ধর্মীয় ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রচেষ্টা নতুন গণতান্ত্রিক সরকার নিয়েছিলো তা স্থগিত হয়ে যায় (Palatino, 2013)। বৌদ্ধ চরমপন্থী ক্ষমতা প্রয়োগকারী সরকার ইতিহাস বিকৃত করে রোহিঙ্গাদেরকে 'বিদেশী অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তারা পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে আরাকানে এসেছে বলে জোড় প্রচার চালায়।

মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বকে অস্বীকার করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ওপর থেকে বৈষম্য বিলোপে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে তা মিয়ানমার জান্তা সরকার পূরনে অস্বীকৃতি জানায়। অধিকন্তু, '৯৬৯ আন্দোলন' এর প্রবক্তাগন মিয়ানমারের বৌদ্ধদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক বিবেচনায় ঐ অঞ্চলের চতুর্দিকে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো মুসলিম অধ্যুষিত দেশ থাকায় তাদের জন্য হুমকি মনে করছে। সারাবিশ্বে মুসলিম মৌলবাদীদের দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে বৌদ্ধ মৌলবাদীরা উদাহরণস্বরূপ তুরে ধরে দেশ ও বিদেশী গোষ্ঠীর কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার প্রচেষ্টা চালায়। বৌদ্ধ মৌলবাদীরা অভিযোগ করে যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মিয়ানমারের ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমাজ ব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ। তারা রোহিঙ্গাদেরকে সন্ত্রাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে (Galache, 2013;The Economist, 2017)। তারা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও অনুসারীদেরকে ধর্মাচারী, নৈতিকতায় পরিপূর্ণ ও অন্যদের জন্য মোটেই ক্ষতিকর নয় এমনটি প্রমান করার চেষ্টা করছে। কিন্তু রাখাইন প্রদেশের বৌদ্ধদের দিকে লক্ষ্য করলে এই প্রচেষ্টাকে হাস্যকর মনে হবে। এখন পর্যন্ত উগ্র জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং মিয়ানমার সরকার সম্মিলিতভাবে হাজার হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠণসহ যে সকল অপকর্ম করেছে তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়। রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত এই জঘন্য কাজকে জাতিসংঘের কর্মকর্তাগন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো "জাতিগত নির্মূলের প্রচেষ্টা" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে (BBC News, 2016; DeHart, 2013; HRW, 2013b;Uddin, 2015)।

মিয়ানমারের মানবিক সংকটের মূলে রয়েছে সেখানকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত দ্বন্দ্ব। পাশ্চত্যের গণমাধ্যম ও এনজিও সংগঠনগুলো এই ধর্মীয় ও জাতিগত দ্বন্দ্বের ওপর জোর দিয়েছে (Karim, 2017)। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ রাখাইন প্রদেশের ওপর মিয়ানমার সরকার ও উচ্চাকাঙ্খী সেনা সদস্যদের লোলুপ দৃষ্টি, বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর পরোক্ষ মদদ এই জাতিগত নির্মূল কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত জিইয়ে রেখেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, রাখাইন প্রদেশের প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ অঞ্চলের অধিকাংশ ভূমির মালিকানা রোহিঙ্গাদের ছিলো, তা অধিগ্রহণ করা হয়েছে কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়ে। রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের দূর্নীতির করেনে এই অব্যবস্থাপনা তৈরী হয়েছে (Karim, 2017)। সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশে ভারত এবং কোরিয়ার কোম্পানী “SHWE” নামক গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলন কার্য পরিচালনা করছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্র। এই গ্যাস ক্ষেত্র থেকে মিয়ানমার সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে (SHWE Gas Movement, 2016)। আরাকান প্রদেশের সীমানায় অবস্থিত দুই প্রতিযোগী রাষ্ট্র ভারত ও চীন ঐ অঞ্চলে বানিজ্যিক সুবিধা লাভের আশায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিশেষ করে তেল-গ্যাস পাইপ লাইন নির্মানে মনোযোগী ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের জাতীয় তেল-গ্যাস কোম্পানী “SHWE” গ্যাস ফিল্ড থেকে তেল উত্তোলনের শেয়ার গ্রহণ করে (Karim, 2017)। প্রকল্পের জন্য মিয়ানমার সেনাবাহিনী জোরপূর্বক গ্রামীন জনগোষ্ঠী ও কৃষকদের বাস্তুচ্যুত করে। বাধ্য হয়ে স্থানিক জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভূমি, সম্পদ ও কৃষি জমি ছেড়ে দেয় (Arakan Gas Research Team, 2006)। এই প্রকল্পসমূহের কারনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, কেননা প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে মূলত রোহিঙ্গাদের আবাস ছিলো। কিছু মানবাধিকার সংগঠন এগিয়ে আসে , কিন্তু তারা রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্ব, ভূমির অধিকার এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রাকৃতিক আইন সংরক্ষণ ও সহায়তা প্রদানে ব্যর্থ হয়। বলাবাহুল্য যে, মিয়ানমারের যে সংকট ও দ্বন্দ্ব তা কেবল ধর্ম ও জাতিগত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং এর মধ্যে আরো বহু ভূ-রাজনৈতিক কারন রয়েছে। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক, ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সুবিধা এবং নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলোকে অবজ্ঞা করা যায় না।

৩.৫ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেক

২০১৭ সালে মিয়ানমারে সংঘটিত ঘটনাসমূহ জাতিসংঘের ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদেকে অবহিত করতে গিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব Antonio Guterres বলেন, "The situation has spiraled into the world's fastest-developing refugee emergency and a humanitarian and human rights nightmare" (UN, 2017b).

জাতিসংঘ মহাসচিব রোহিঙ্গা সমস্যাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিপর্যয়ের সাথে তুলনা করেন এবং UNHCR এর হাই কমিশনারের মতে, মিয়ানমার সরকার ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ওপর যে নিপীড়ন করা হয়েছে তাতে "জাতিগত নির্মূল" এর প্রমান রয়েছে। ২৫ আগস্ট ২০১৭ থেকে উত্তেজনা, সংঘাত শুরু হওয়ার পরবর্তী সময়ে বিশ্ব মানবাধিকার সংগঠন ও উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার এর কাছে সবচেয়ে উদ্বেগজনক মানবাধিকার সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। সামরিক বাহিনীর চলমান নিপীড়নমূলক অভিযান বন্ধ করতে এবং উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে মিয়ানমার সরকারকে জাতিসংঘ মহাসচিব নির্দেশ দেন। একইসাথে বাংলাদেশ সরকারকে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু গ্রহণ ও মানবতার হাতকে প্রসারিত রাখতে অনুরোধ করেন (BBC News, 2018)। পূর্বে সংঘটিত সহিংসতার সংবাদ আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হলেও তা খুব কম গুরুত্ব পেতো। কিন্তু আগস্ট ২০১৭ সালের ঘটনা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং মিয়ানমার সরকারের ওপর বহুমুখী চাপ তৈরী করে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর বহুমাত্রায় নিপীড়ন শুরু হলে নিউইয়র্ক টাইমস(NYT) এবং ইন্টার প্রেস সার্ভিস (IPS) বিশ্বের সামনে নিপীড়নের বাস্তব চিত্র প্রকাশ করে দেয়। রোহিঙ্গাদের ফেসবুক পেইজ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের নজর কাড়ে এবং সংগঠনগুলো রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ায় (Brooten,Ashraf & Akinro, 2015:718-719)। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ মিয়ানমার সরকারের নিকট রোহিঙ্গা নিপীড়ন বন্ধের আহ্বান জানায় এবং একইসাথে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুকে নিজ ভূখন্ডে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয় (Kipgen, 2014:237)।

আগস্ট ট্রাজেডির পর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তৎকালীন মিয়ানমার সরকার প্রধান ও ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি)

দলের নেতা অং সান সুচিকে তার ভুমিকা নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি ও তার দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ উঠে (Htusan & Mendoza, 2017; Murdoch, 2018)। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে সংকট সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন না করায় কঠোর সমালোচনা করে। ২০২১ সালে সামরিক বাহিনী সুচিকে ক্ষমতাচ্যুত করে পুনরায় ক্ষমতা দখল করেছে এবং সরকার ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু মিয়ানমার সরকার অভিযোগ করে যে, এখানকার সংকট তৈরীর কারন হলো সামরিক বাহিনীর পোস্টে রোহিঙ্গাদের আক্রমন(Karim, 2017)। এভাবে মিয়ামারের সংকট ধর্মকেন্দ্রীক সমস্যা হিসেবে রূপ নিয়েছে, যার ফলে রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিবর্তন এসেছে এবং সেদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রায়নের পথ কন্টকাকীর্ণ ও স্থবির হয়ে পড়েছে (International Crisis Group, 2017; Walton & Hayward, 2014)।

৩.৬ বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু

কক্সবাজারের নয়াপাড়া উদ্বাস্তু ক্যাম্পের ১৯ বছরের এক যুবক তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “I was born in Burma, but the Burmese government says I don’t belong there. I grew up in Bangladesh, but the Bangladesh government says I cannot stay here. As a Rohingya I feel I am caught between a crocodile and a snake” (Frontiers-Holland, 2002:8).

বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের ২৭১ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে এবং রাখাইন প্রদেশে বসবাসরত বাংলা ভাষী রোহিঙ্গাদের সাথে বাংলাদেশের মানুষের ঐতিহাসিকভাবে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ঐতিহ্যগতভাবে সকল সমস্যার ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাস করে আসছে। বর্তমান সময়ে পার্শ্ববর্তী বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের মধ্যে মানব নিরাপত্তা এবং ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে (Ibrahim, 2016:26; Parnini, 2013:287)। ১৯৯২ সালে UNHCR এর মধ্যস্থতায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে Memorandum of Understanding(MOU) এর আওতায় রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আরাকানে ফেরত পাঠানোর চুক্তি হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই চুক্তি অনুযায়ী খুব কম সংখ্যক রোহিঙ্গা স্বদেশে ফেরত যেতে রাজি হয়েছে। তাদের

ফেরত না যাওয়ার কারন একটাই, আর সেটা হলো নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ (Ventura, 2014:25)।

২০১৭ সালের শেষের দিকে সহিংসতা বেড়ে যাওয়ায় নিয়মিতভাবে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর ঢল নামে এবং দুই দেশের কূটনীতিতে স্থবিরতা দেখা দেয়। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ অভিযোগ করে যে, তারা সীমান্তে ল্যান্ড মাইন স্থাপন করছে, যাতে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ থেকে বর্ডার পার হয়ে ফেরত যেতে নিরুৎসাহিত হয় (Das, 2017)। মিয়ানমার জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের ‘ল্যান্ড মাইন’ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ নয়। মিয়ানমার সামরিক বাহিনী তৎপরতার সাথে সীমান্তে বেড়া তৈরী করছে এবং বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি ‘ল্যান্ড মাইন’ স্থাপন করছে ।

ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সহিংসতা, নিপীড়ন ও অত্যাচারের কারনে রোহিঙ্গারা যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে তা বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সংঘর্ষময় সম্পর্কের জন্ম দিয়েছে। মানবিক ও নিরাপত্তা ইস্যু এমন একটি পর্যায়ে পৌছে গেছে যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তেক্ষেপ জরুরী হয়ে পড়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া

৪.১ বৈশ্বিক মানবাধিকার আন্দোলনের পটভূমি

আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের সকল মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় জাতিরাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের নেতৃত্বে সার্বজনীন মানবাধিকারের দলিল (UDHR) রচিত হয় (UN, 2018)। UNHCR মানুষের যেসকল মানবাধিকারের নীতির স্বীকৃতি দেয় তাতে সকল মানুষের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে তার জাতীয়তা, ধর্ম, বর্ণ , ভাষাগত ভিন্নতা, লিঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ের জন্য কোনো পার্থক্য করা যাবে না। মৌলিক মানবাধিকারের এই বৈশ্বিক ঘোষণা আসার পরবর্তীকালে মানবাধিকার রক্ষায় বহু চুক্তি, বিশেষ করে আঞ্চলিক মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তি, অঙ্গীকার,জাতীয় আইনের মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। জাতিরাষ্ট্রসমূহ জাতীয় আইনের মাধ্যমে এখন নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। কেননা সেখানে বিদ্যমান মানবাধিকারের আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আইন বাস্তবায়ন অসম্ভব। এছাড়াও মানবাধিকারের সাথে আরো কিছু অতিরিক্ত ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় যুক্ত হয়েছে, যেমন: কর্মের অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও নীতি। সাম্প্রতিক কালে UDHR এর মৌলিক নীতিসমূহের অনেকগুলোর ক্ষেত্রে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে জাতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নিপীড়ন এবং বাস্তুচ্যুতি (UNHCR, 2007)।

মিয়ানমারসহ অধিকাংশ জাতিরাষ্ট্র মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছে এবং মানবাধিবাধিকার সনদের অনুমোদন দিয়েছে (UNHCR, 2017)। পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক জোট ASEAN তাদের সংগঠনের গঠনতন্ত্রে মানবাধিকারের জন্য একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছে এবং এই সংগঠনের সদস্য হিসেবে মিয়ানমার ২০০৯ সাল থেকে মৌলিক মানবাধিকারের স্বীকৃতি ও তা

অনুমোদন করেছে (Arendshorst, 2009)। কিন্তু মানবাধিকার দলিলে স্বাক্ষরের পর সেখানকার জনগনের মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় এবং মানুষের ওপর মিয়ানমার সরকারের অত্যাচারী মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,' সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বিচার বহির্ভূত হত্যা, ধর্ষণ এবং বিভিন্ন রকম যৌন নির্যাতন অবিরাম করে যাচ্ছে', এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন, কারাবন্দী, জোরপূর্বক শ্রমে নিয়োগসহ নানা রকম অত্যাচার চালায় (UN, 2005) ।

জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর মতে, 'বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী'র মধ্যে রোহিঙ্গা অন্যতম এবং তারা যুগের পর যুগ মিয়ানমারে বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে (UN, 2017; Amnesty International, 2017)। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তাদের চলাচল ও গতিবিধি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। আর এভাবেই রোহিঙ্গারা একটি রাষ্ট্রহীন জাতিতে পরিনত হয়েছে যাদের কোনো ভূমির মালিকানা নেই, চাকরির অধিকার নেই এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত (European Commission, 2018)। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘন ও নিপীড়ন চলছে। মানবাধিকার রক্ষায় লিখিত অঙ্গীকার সত্ত্বেও মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে, যদিও বহু বছর ধরে জাতিসংঘ, জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা এবং বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা সরকারকে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে (UNHCR, 2017; Zawaki, 2012:21)। মিয়ানমার দাবি করছে যে, রোহিঙ্গারা দক্ষিণ ভারত তথা বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে মিয়ানমারে প্রবেশ করেছে। তারা আরো বলেছে যে, মিয়ানমারের স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের শেষ দিকে আরাকানে রোহিঙ্গাদের প্রবেশ ঘটেছে (Azad & Jasmin, 2013: 26)। এই কারনে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বকে অস্বীকার করছে (Taylor, 2009:156-

157)। মিয়ানমারের সামরিক সরকার রোহিঙ্গাদেরকে সহিংসতা থেকে বাঁচতে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে (Farzana, 2011:17)।

৪.২ রাখাইন প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

রাখাইন প্রদেশের পূর্ব নাম আরাকান। এর উত্তরে চীন প্রদেশ পূর্বে ম্যাগওয়ে, বাগো ও আইয়ার্দি এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত (Min, 2016)। রাখাইন প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগ অবস্থিত। রাখাইন প্রদেশের রাজধানীর নাম সিত্তে। ২০১৪ সালের আদমশুমারি অনুসারে রাখাইনের জনসংখ্যা ২,০৯৮,৮০৭ জন এবং আয়তন ৩৬,৭৭৮ বর্গ কিলোমিটার। ২০১৭ সালের সংকটের পূর্বে রাখাইনে প্রায় দশ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করতো। তবে মিয়ানমারের আদমশুমারিতে অন্তর্ভূক্ত না হওয়ায় রোহিঙ্গাদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারন করা সম্ভব নয় (Muhammad et al., 2017)। রাখাইন অঞ্চলে কেবল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও সরকারের মধ্যেই সংঘাত সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং সেখানে রোহিঙ্গা ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মাঝেও দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিদ্যমান রয়েছে (Micro, Goetz & Murage, 2017)।

৪.৩ মিয়ানমারে মানবাধিকার লংঘন

মানকবাধিকারের মূলনীতি হলো একটি ভূখন্ডে বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠী সমান অধিকার ও মর্যাদার সাথে বসবাস করবে (Ullah, 2011:149)। মানুষ হিসাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বাধীনভাবে ও সম্মানের সাথে বাঁচার অধিকার আছে । হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর মতে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে অন্যায়ভাবে নাগরিকত্বহীন করা হয়েছে, চলাফেরার স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। শিক্ষা,চাকরি এবং তাদের জীবন যাপনের জন্য মৌলিক প্রয়োজনকে মিয়ানমার সরকার সংকুচিত করেছে (HRW, 2016)। রোহিঙ্গাদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে বিপদাপন্ন ও নিপীড়িত সংখ্যালঘু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মিয়ানমার সরকার তাদের রাষ্ট্রীয় মৌলিক অধিকার ও জাতীয় নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে (Hofman, 2016; Tonkin, 2015)। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা দমন-পীড়নের স্বীকার হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭৮, ১৯৯১-১৯৯২, ২০১২, ২০১৫ এবং ২০১৬-২০১৭ সালে সেনা বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের তথ্য-প্রমানকে তুলে ধরা যায়। রোহিঙ্গা

জনগোষ্ঠীর ওপর চলমান এই নিপীড়নকে জাতিসংঘ এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ‘জাতিগত নিধন’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে (Lone & Naing, 2017; UN News, 2014)। রোহিঙ্গা সমস্যার ঐতিহাসিক বিতর্ক রয়েছে, পাশাপাশি ধর্মীয় দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে (Wolf, 2017:2-3)। পূর্ববর্তী সময়ে মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরাপত্তার অজুহাতে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের রপর অত্যাচার, নিপীড়ন চালানো হয়েছে, জাতিসংঘ এটিকে “ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ” হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু বর্তমানকালে সেনাবাহিনী কর্তৃক যে রোহিঙ্গা নিপীড়ন হচ্ছে সেখানে পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে মিয়ানমার ভূখন্ড থেকে রোহিঙ্গাদেরকে স্থায়ীভাবে উৎখাতের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় (Safi, 2018)। উদাহরণ হিসাবে দেখা যায়, ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে রোহিঙ্গা নিধন শুরু হলে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও স্থানীয় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী সুসংগঠিতভাবে আক্রমন পরিচালনা করে রোহিঙ্গাদের ঘর-বাড়ি, মসজিদ, মাদ্রাসা সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে ও ভেঙ্গে ফেলা হয়, যাতে তাদেরকে মিয়ানমার ভূখন্ড থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায় (HRW, 2013: 4)। মিয়ানমারে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক Yanghee Lee বলেন,“ সরকার স্থায়ীভাবে রোহিঙ্গাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার নকশা অঙ্কনপূর্বক নিপীড়ন চালাচ্ছে (The Independent, 2017)। Yanghee Lee এর এই ধারনার পেছনে পূর্ববর্তী বছরগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে যথেষ্ট তথ্য -প্রমান ও সত্যতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, জানুয়ারি, ২০১৪ সালে স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় মিয়ানমার নিরাপত্তা রক্ষীদের সাথে যৌথভাবে বেশ কিছু রোহিঙ্গা গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এর ফলে প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় (Brooten, 2015: 137)। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গা নিধনের চূড়ান্ত স্তর শুরু হয় এবং এর ফলে ৬৮৮,০০০ এর বেশি রোহিঙ্গা জীবন বাঁচাতে সমুদ্র পথে বা পায়ে হেঁটে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। মিয়ানমার সরকার প্রচার করতে থাকে যে, সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু এই সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে তারা অবাধে নারী- শিশু হত্যা ও ধর্ষণ এবং গণহত্যা চালাতে থাকে, মানবাধিকার সংগঠনগুলো যাকে ‘জাতিগত নিধন’ হিসেবে চিহ্নিত করছে (Safi, 2018; Siddique, 2017)। মিয়ানমারের তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল এন.এল.ডি. এর মুখপাত্র নে উইন বলেন যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

নয় বরং তারা অবৈধ অভিবাসী এবং রাষ্ট্র তাদের অধিকার রক্ষায় দায়বদ্ধ নয় (Freeman, 2017)।

মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা, কল্যাণ কিংবা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগের বিষয়ে উদ্বিগ্ন নয়। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ঘর-বাড়িগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং নারী- শিশূদের বাধ্য করে স্বাক্ষ্য দেওয়ানো হয়েছে যে, সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়নি (BBC News, 2017)। কিন্তু যখন স্যাটেলাইট ইমেজে ধরা পড়লো যে, সেখানে প্রায় ১২০০ ঘর-বাড়ী সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন সরকার বলল যে, রোহিঙ্গারা নিজেরাই নিজেদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। সরকারের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান তাদের এই ভনিতা বন্ধের আহ্বান জানান। বাংলাদেশে UNHCR এর প্রধান Jhon Mckissick আরাকানের নৃসংসতার চিত্র তুলে ধরেন এভাবে, “ নিরাপত্তা বাহিনী পুরুষদের হত্যা করছে, গুলি করছে, শিশুদের হত্যা করছে, নারীকে হত্যা ও ধর্ষণ করছে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে এবং নদী পার হয়ে বাংলাদেশে আসার জন্য জবরদস্তি করা হয়েছে (BBC News, 2016, 24 November)।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ বন্ধ করে রোহিঙ্গাদের প্রতি মানবাধিকার লংঘনের আরেকটি নজির সৃষ্টি করেছে মিয়ানমার সরকার। বিশ্বের নিপীড়িত, যুদ্ধবিধ্বস্ত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে কাজ করে Medicine Sans Frontiers (MSF) । ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Medicine Sans Frontiers এর চিকিৎসক ও কর্মচারিদেরকে রোহিঙ্গাদের পক্ষে এবং সরকারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অজুহাতে মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। সেখানে মিয়ানমার সরকারের অত্যাচারে ভঙ্গুর প্রায় ১০ লাখ নিপীড়িত ও অসহায় রোহিঙ্গাকে MSF চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছিলো। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে আরাকানের রাজধানী সিত্তেতে অবস্থিত MSF এর প্রধান কার্যালয়ে অস্ত্রধারী বেসামরিক সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। ফলে প্রায় ৩০০ এর অধিক আন্তর্জাতিক সহায়তাকর্মী সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং সেখানকার স্থানিক

জনগোষ্ঠী তাদের স্বাস্থ্য সেবার ন্যুনতম প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় (Brooten, 2015: 135)।

চিত্র ৩: ২৫ আগস্ট, ২০১৭ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত রোহিঙ্গা গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার চিত্র, তথ্যসূত্র: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২০১৭।

এছাড়া যেসকল এনজিও রোহিঙ্গাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা ও দ্বন্দ্ব নিরসনে কাজ করছিল তারা স্থানীয় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর রোষানলে পড়েন। এনজিওগুলোর ওপর সরাসরি আক্রমন করার সাহস ছিলো না বিধায় সামরিক সরকার স্থানীয়দের মাঝে এই বিদ্বেষমূলক মনোভাব তৈরীতে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছে (Brooten, Ashraf & Akinro, 2015)।

সামরিক বাহিনী বিভিন্ন সময়ে ‘সন্ত্রাস বিরোধী’ অপারেশনের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হুমকি নিরসনে অভিযান পরিচালনা করে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে রোহিঙ্গাদের গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে (BBC News, 2017)। আক্রান্ত রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিদেশী পর্যবেক্ষক, এনজিওকর্মী এবং সংবাদকর্মীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে, যাতে সেখানে পরিচালিত নৃশংসতার খবর বাহিরে প্রকাশ না পায়। এভাবে আরাকানে নিরব গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। বিশ্ব সম্প্রদায় এই সংকট নিরসনে ব্যর্থ হয়েছে এবং নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে (*The Independent*, 2017)।

চূড়ান্ত পর্যায়ের অত্যাচার নিপীড়ন ছাড়াও সরকার চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে জীবন ধারনের জন্য রোহিঙ্গাদের চাকুরি ও উপার্জনের সকল পথ বন্ধ করে রেখেছে যা স্পষ্টত মানবাধিকারের লঙ্ঘন। সামরিক বাহিনী রাখাইনের উত্তরাংশে বিদেশী সাহায্য ও খাদ্য সহায়তা সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে সেখানে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরম ক্ষুধা ও অপুষ্টি দেখা দেয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশে আসা উদ্বাস্তুদের চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী চিকিৎসক ও কর্মীরা (Klug, 2018)। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তথ্য দেয় যে, মিয়ানমার সেনাবাহিনী রাখাইনের সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে কৌশলগতভাবে অস্ত্র হিসেবে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদেরকে ক্ষুধার্ত রেখে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত করতে চায়। বিগত কয়েক দশকের চলমান সহিংসতার ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে ২০১৭-২০১৮ সময়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে অবনতি হচ্ছে, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর এমন রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশে ২৫ আগস্ট ২০১৭ থেকে রোহিঙ্গা নিপীড়ন ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (Amnesty International, 2018)। অত্যাচারিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে এবং অমানবিক জীবন যাপন করছে (Karim, 2017)। মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন নতুন কোনো ঘটনা নয় বরং এর ভীত তৈরী হয় স্বাধীনতা উত্তর দশকগুলোতে, মানবাধিকারকে সরকার ও স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় বারংবার পদদলিত করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের অত্যাচার, নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন এর

প্রেক্ষাপট ভিন্ন, কেননা বর্তমান সরকার রোহিঙ্গাদেরকে মিয়ানমারের ভূখন্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে চায়(European Commission, 2018: 1)।

৪.৪ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জন্য বৈধ ও আইনানুগ কাঠামো

১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশন এবং ১৯৬৭ সালের প্রটোকল এর মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের জন্য আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকার রক্ষার ভিত্তি রচিত হয়েছে। মৌলিক মানবিক সহায়তা ও উদ্বাস্তুদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। UNHCR এর তত্ত্বাবধানে উদ্বাস্তুদের মানবাধিকার ও মানবিক চাহিদা পূরনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের কনভেনশন ও ১৯৬৭ সালের প্রটোকলে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র নয়। কিন্তু বাংলাদেশ ১৯৪৮ সালের আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের স্বীকৃতিপত্রে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র যা দেশটিকে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদেরকে সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য চাপ তৈরি করেছে। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নিপীড়ন শুরু হলে বাংলাদেশের ওপর এর ভয়াবহ প্রভাব পড়ে। রোহিঙ্গারা সেনাবাহিনীর অত্যাচার, হত্যা, নির্যাতন থেকে বাঁচতে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ১৯৭৮ সাল থেকে মিয়ানমারে নিপীড়নের শিকার হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে ধাপে ধাপে মানবিক বিবেচনায় নিজ ভূখন্ডে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ নজির সৃষ্টি করেছে (Mohammad et al., 2017:1842)। পরবর্তিতে বিভিন্ন সময়ে UNHCR এর তত্ত্বাবধানে কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফেরত গিয়েছিলো। কিন্তু ১৯৯০ সালে সামরিক অভিযানের পর মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুরা এখনও বাংলাদেশে বসবাস করে আসছে (Azad & Jasmin, 2013:1)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অধ্যায়ে ২৫ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন সম্পর্কিত বিধান করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৫ এর (গ) তে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন দিবে। অনুচ্ছেদ ৩১ এ বলা হয়েছে যে, আইনানুযায়ী ব্যতীত বাংলাদেশের ভূখন্ডে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরত কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা,দেহ সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটানো যাবে না। এছাড়া রাষ্ট্র নিগ্রহ বা নির্যাতনের শিকার ও আশ্রয় প্রার্থীর অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণে বদ্ধপরিকর। নিরাপত্তা ঝুঁকির প্রেক্ষিত বাংলাদেশ মিয়ানমারে কোনো রোহিঙ্গাকে

ফেরত পাঠাতে পারে না (Mohammad, 2011:405-410)। ১৯৯৩ সালে UNHCR বাংলাদেশ সরকারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করে যেখানে রোহিঙ্গাদের সার্বিক নিরাপত্তা, ব্যবস্থাপনা ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (Alam, 2012:129) ।

কিন্তু বাংলাদেশে কোনো জাতীয় আইন বা আইনগত কাঠামো নেই যার ভিত্তিতে উদ্বাস্তুদের বিষয় ও অধিকার নিশ্চিত হয় (Mohammad, 2011:418) । ২০০৫ সালে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় মিয়ানমারের সাথে UNHCR এর সহযোগিতায় ২ লাখ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও মিয়ানমার সরকারের অনিহার কারনে সেই উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায় (Ministry of Foreign Affairs, 2014:1)।

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা ও অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ২০১৪ সালে একটি কৌশলপত্র তৈরী করে যেখানে রোহিঙ্গাদের উদ্বাস্তুতে পরিনত হওয়ার কারন অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়। মুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু তৈরীতে মিয়ানমারকে আন্তর্জাতিক কিছু শক্তি মদদ জুগিয়েছে (Abrar, 2015)। জাতীয় নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে সীমান্তে টেকসই নিরাপত্তা জোরদারের ক্ষেত্রে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ ও অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের তালিকা প্রস্তুতকরণে এই কৌশলপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে কাজ করে এবং মিয়ানমারেরর সাথে নিরাপত্তা আলোচনা এবং আঞ্চলিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে (Abrar, 2015)। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নানামুখি শর্তের কারনে স্বেচ্ছায় উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয় (HRW, 2017)। এছাড়া UNHCR উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসনের জন্য প্রত্যাবাসিত দেশে উদ্বাস্তু গ্রহণ সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এর জন্য একটি গাইডলাইন দিয়েছে (Abrar, 1996)। উদ্বাস্তু শিবিরগুলো তার ধারন ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে যা স্থানিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ক্যাম্পগুলোতে নিরাপত্তা ও সেবা বাড়িয়ে নতুন উদ্বাস্তুদের জন্য আকর্ষণ তৈরি করতে চায় না।

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসনকে তরান্বিত করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সালে UNHCR এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে (*The Daily* Star, 2018)। এই চুক্তির অধীনে UNHCR রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে এবং উদ্বাস্তুদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের সম্মতি গ্রহণ, অস্থায়ী ক্যাম্পের নিরাপত্তা বিধান ও পরিবহন সহায়তা প্রদান করবে। মিয়ানমারে ফেরত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত UNHCR রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা ও যাবতীয় সহায়তা প্রদান করবে (*The Daily* Star, 2018)। কিন্তু নিরাপদ ও টেকসই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমার এখনও উপযোগী নয়। বাংলাদেশের ক্যাম্পগুলোতে রোহিঙ্গাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক কোনো বিষয় নয় বরং শান্তিপূর্ণভাবে প্রত্যাবাসনই এই সমস্যার একমাত্র স্থায়ী সমাধান।

৪.৫ কক্সবাজারের স্থানিক জনগোষ্ঠী ও উদ্বাস্তুদের মধ্যকার সম্পর্ক

মানবিক কারনে উদ্বাস্তুদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনে স্থানিক জনগোষ্ঠী এগিয়ে আসে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিসমূহের আলোকে স্থানিক জনগোষ্ঠী ও উদ্বাস্তুদের মাঝে সম্পর্ক গড়ে ওঠে (Abey, 2013:xi)। এরকম উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্থানিক জনগোষ্ঠীর খুব সামান্যই করার থাকে। একটি অঞ্চলে আগত উদ্বাস্তু এবং স্থানিক জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ক বিভিন্ন দিক দিয়ে সাংঘর্ষিক হয়ে থাকে। সেখানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং ধর্মীয় ভিন্নতা দেখা যায় যা দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের কক্সবাজারেও এরকম একটি সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে (UNDP & UN Women, 2017)।

বাংলাদেশ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে, কিন্তু স্থানিক জনগোষ্ঠী তাদের মাঝে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উদ্বাস্তু গ্রহণকে বিরোধিতা করছে (UNDP & UN Women, 2017)। রোহিঙ্গাদের সাথে স্থানিক জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়ে কিছু মিল রয়েছে। তবে অশিক্ষা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, উগ্রতা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত থাকায় রোহিঙ্গাদেরকে স্থানিক জনগোষ্ঠী নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে। উদ্বাস্তু শিবির নির্মানের ফলে পরিবেশ দূষণ, বনভূমি উজারকরণ, পাহাড় ধ্বংস ইত্যাদি কারনে স্থানিক জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে। উত্তম সুরক্ষা বলয় নিশ্চিতকরণে স্থানিক জনগোষ্ঠী সরকারের নিকট আবেদন করেছে, যাতে উদ্বাস্তুদের চলাচল ও গতিবিধি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে ও পরিবেশের ওপর চাপ কম পড়ে।

৪.৬ উদ্বাস্তু ক্যাম্প পরিস্থিতি

বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট এর পূর্বে উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করতো (Rahman, 2010)। কিন্তু ২৫ আগস্ট ২০১৭ এর পর উদ্বাস্তু অন্তঃপ্রবাহ পূর্বের সকল ইতিহাসকে ছাড়িয়ে যায়। এমন পরিস্থিতির জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং স্থানিক জনগোষ্ঠী প্রস্তুত ছিলো না। এ সময়ে ক্যাম্পগুলোতে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা বেড়ে ধারন ক্ষমতা অতিক্রম করে এবং স্থানিক জনসংখ্যার চেয়ে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বেড়ে যায়। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাসমূহের সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার সংকট মোকাবিলার চেষ্টা করে। উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলো আকস্মিক বন্যা, ভূমিধস ও পরিবেশগত দুর্যোগ এর হুমকির মধ্যে রয়েছে (Inter Sector Coordination Group [ISCG] , 2018:1)। ২০১৭/২০১৮ সালের উদ্বাস্তু অন্তঃপ্রবাহের পর বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার ক্যাম্পগুলোতে অবস্থানরত রোহিঙ্গার সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে যায় (European Union, 2018:3)। নিচের চিত্র- ৪ ও চিত্র ৫- থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

চিত্র ৪: মানচিত্রে কক্সবাজার উদ্বাস্তু শিবির, সূত্র: Inter Sector Coordination Group (2018)

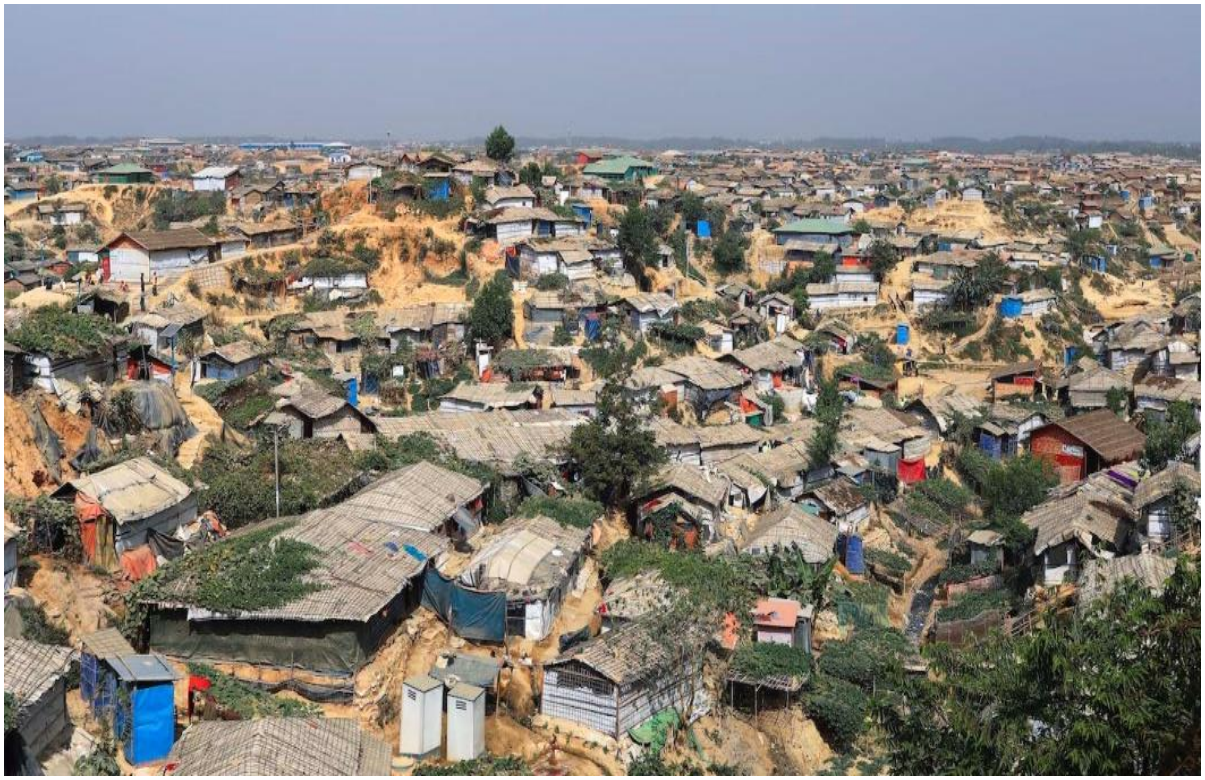

চিত্র ৫:কক্সবাজার উদ্বাস্তু শিবির, সূত্র: Inter Sector Coordination Group (2018)

কক্সবাজারের উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে উদ্বাস্তুদের জন্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো জরুরী ভিত্তিতে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান, খাদ্য সহায়তা ও চিকিৎসা সহায়তার ব্যবস্থা করেছে, যেখানে ১,১৬৭,০০০ লোকের জন্য যথার্থ সুযোগ তৈরী করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং (Inter Sector Coordination Group, 2018:3) । ক্যাম্প এর নির্দিষ্ট এলাকায় পয়ঃব্যবস্থাপনা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মান এবং স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরিতে সাহায্য সংস্থাগুলো ব্যস্ত। কিন্তু উদ্বাস্তু উপস্থিতির কারনে পার্শ্ববর্তী যে স্থানগুলোতে স্থানিক জনগোষ্ঠী বসবাস করছে সেখানে নানা রকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে জীবনাচরন বদলে যাচ্ছে, সেদিকে সাহায্য সংস্থাগুলোর নজর খুব কমই পড়েছে। মানবিক সহায়তার অংশ হিসাবে জাতিসংঘ স্থানীয় লোকদের কাজের সুযোগ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে (Schlein, 2017)। সংকট সমাধানের টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না।

৪.৭ উদ্বাস্তু বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি

সাধারণভাবে একজন মানুষের অন্য একটি রাষ্ট্রে আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার রয়েছে। ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রত্যেক ক্যক্তির জাতীয়তা এবং নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সার্বজনীন মানাধিকারের স্বীকৃতি বলে একজন ব্যক্তি নিজ দেশে নিপীড়নের স্বীকার হলে অন্য দেশে আশ্রয় চাইতে পারবে (Yasmin, 2017:71)। আশ্রয় প্রার্থনার দুটি নীতি রয়েছে। প্রথমত, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে আশ্রয় প্রার্থীকে উদ্বাস্তু হিসাবে অনুমোদন দেওয়ার। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৮ সালের UDHR এর ধারা ১৪(১) অনুযায়ী নিজ দেশে ধর্ম, রাজনীতি, এথনিসিটি এবং অন্যান্য কারনে নিপীড়ন এড়াতে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় প্রার্থনা করার। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের এই ধারা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে আরো বেশি শক্ত পোক্ত করা হয়েছে (Mohammad, 2011:403)। । অত্যুক্তি হলেও সত্য যে, মিয়ানমার আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের (UNHCR) স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। কিন্তু মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতা, নাগরিকত্ব এবং জীবনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে (UNHCR, 2017:20)। আদি অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও আরাকানে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় সম্পত্তির অধিকার হারিয়েছে, অন্যায়ভাবে নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে (Razzaq & Haque, 1995:40)। মিয়ানমার সরকার ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্বের স্বীকৃতিকে অস্বীকার করে যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ১৫ অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক। এছাড়া সরকার রোহিঙ্গাদেরকে নৃ-গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। এটা স্পষ্ট যে, মিয়ানমার যে সমস্ত আন্তর্জতিক আইন ও রীতি নীতি অনুস্বাক্ষর করেছে তার সব কিছু রোহিঙ্গা সংকটের ক্ষেত্রে ভঙ্গা করেছে এবং মানবাধিকার লংঘন , বৈষম্য তৈরি ও বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করে আইন ও নীতি প্রণয়ন করে মানবিক সংকটকে ত্বরান্বিত করেছে (Amnesty International, 2018)।

৪.৮ মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বিষয়ে জাতিসংঘের পদক্ষেপ

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পরবর্তি সময়ে সারা বিশ্বের মানবাধিকার বিষয়ক ইস্যুসমূহ দেখাশুনার লক্ষ্যে বেশ কিছু সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সিল এবং উন্নয়ন ও মানবাধিকার বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদ দায়িত্ব নিয়েছে

(Deppermann, 2013:297)। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক সংস্থা UNHCR উদ্বাস্তু সংকটের স্থায়ী সমাধান, উদ্বাস্তুদের বৈশ্বিক নিরাপত্তা, এনজিও ও সরকারসমূহের উদ্বাস্তু বিষয়ক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে (Imran & Mian, 2014:228)। বর্তমানে বিশ্বে উদ্বাস্তুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে উদ্বাস্তুদের নিরাপত্তা বিধানে UNHCR একটি কার্যকরী সমাধানের ঘোষণা দিয়েছেন এবং উদ্বাস্তুদের জীবনমান বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিচ্ছে (Kiragu, Rosi & Morris, 2011:1) । জাতিসংঘের মানবাধিকার নিয়ে দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং জাতিসংঘভূক্ত কোনো রাষ্ট্রে যদি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, তাহলে সেখানকার মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ) (Deppermann, 2013:298) । রোম সংবিধি অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা ICC জাতিসংঘের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা মতো মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে ICC এর ক্ষমতা রয়েছে তা তদন্ত করার। মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন ও আইন লঙ্ঘনের শুনানী করার ক্ষেত্রে ICJ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ICJ কে ICC এর জন্য আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের অধিকার প্রদান করেছে (Deppermann, 2013:299-301)।

নির্যাতনের শিকার উদ্বাস্তু, যেমন: রোহিঙ্গা অথবা যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে এবং উদ্বাস্তু সংকট নিরসনে ICJ ও ICC গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে (Deppermann, 2013:315)। UNHCR উদ্বাস্তু সমস্যার কার্যকরী সমাধান এবং তাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর মধ্যে আলোচনা শুরু এবং উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসনে সমঝোতা স্মারক বা MoU স্বাক্ষরের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে আইনগতভাবে চাপ প্রয়োগ করতে পারে (*The Daily Star*,2018)। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করা গেলে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে বিবেচিত হবে। রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ মদদে অত্যাচার-নিপীড়ন পরিচালনা করে মিয়ানমার অন্যান্য রাষ্ট্র ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলোকে দায়ী করছে। মিয়ানমার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ও অন্যান্য মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থাগুলোকে আরাকানের বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে প্রতিনিধিদের প্রবেশে বাধা প্রদান করেছে। রোম চুক্তি স্বাক্ষরকারী না হওয়ায় মিয়ানমার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারের আওতাধীন নয়। তথাপি ICC বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের ঘটনা প্রবাহ তদন্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে। এক্ষেত্রে

গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটনে সেনা বাহিনী ও বেসামরিক নাগরিকদের ভূমিকা তদন্ত করা হবে (Ochab, 2018)।

৪.৯ রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় স্টেকহোলডারদের সাড়াদান

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়ে অংশীগোষ্ঠীগুলো ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্বেগ দেখিয়েছেন, বিশেষ করে এই সংকটের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন, এমন জনগোষ্ঠীর বিষয়ে (Brooten, Ashraf & Akinro, 2015:725)। উদাহরন হিসাবে দেখা যায়, যখন আরাকানে মানবিক বিপর্যয় শুরু হলো তখন বিশ্বের বড় বড় প্রচার মাধ্যমগুলো তা বিশ্বের কাছে বিস্তারিতভবে তুলে ধরেছে। এর ফলে বিশ্ববাসী রোহিঙ্গা সংকট সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পেরেছে। মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা এনজিও ও অন্যান্য সংস্থাগুলো বৃহৎ আয়তনে মানবিক সহায়তা নিয়ে হাজির হয়েছে (Brooten, Ashraf & Akinro, 2015:730)। বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে রোহিঙ্গা সংকট সম্পর্কে সংবাদ ও তথ্য প্রচারের কারণে বিষয়টি সকলের নিকট গুরুত্ব পেতে শুরু করে। অংশীগোষ্ঠীর যথাযথ সাড়াদানের কারণে উদ্বাস্তু সংকটের সাময়িক বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এছাড়া কিছু এনজিও অত্র অঞ্চলের মানবিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় অংশীদারিত্বের পরিচয় বহন করে। UN এবং UNHCR অন্যান্য মানবিক সহায়তাদানকারী সংস্থাগুলোর দৃষ্টি আকর্ষন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে ভুমিকা পালন করেছে। তাদের অধিকাংশ সংগঠন বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে বাড়ি-ঘর নির্মাণ, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরন, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছে (Kigaru, Rosi & Morris, 2011:9)। জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আরো কিছু রাষ্ট্র সরাসরি মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপের পথ দেখান নি, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া এবং ইন্দেনেশিয়ার মতো রাষ্ট্রগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বন্দ্ব নিরসনে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন (Kinacioglu, 2012:16)।

আঞ্চলিক সংস্থা ASEAN ও মিয়ানমারের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো আরাকানে চলমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং মানবিক নিরাপত্তার অভাবকে অত্র অঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য হুমকি হিসাবে বিবেচনা করছে (Thuzar & Rieffel, 2018;

Zawacki, 2012:18)। পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হতে পারে যদি রোহিঙ্গা ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় কারনে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়, এমন ভয় রয়েছে অনেক রাষ্ট্রের । তাছাড়া মিয়ানমারের ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ও আই.এস.আই. এর মতো গোষ্ঠীগুলোকে উৎসাহিত করতে পারে। ২০১৮ সালে ৫৩ সদস্যরাষ্ট্র বিশিষ্ট ওআইসি এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও কূটনীতিক পর্যায়ের এক সম্মেলনে রোহিঙ্গা মুসলিম সংকটের প্রেক্ষাপটে মিয়ানমারের ওপর অবরোধসহ আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে (AFP, 2018)।

সহিংসতার কারনে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সংকট সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সংকটে রূপ নিচ্ছে, এতে অংশীগোষ্ঠীগুলোর দৃষ্টি মিয়ানমারের ওপর গিয়ে পড়ছে । যেমন: মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, “মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সমস্যা এখন আর তাদের নিজস্ব বিষয় নয় বররং আন্তর্জাতিক আলোচ্য বিষয়” (*Al Jazeera*, 2016)। রোহিঙ্গা এখন কেবল মানবিক সংকট নয়, এটি বাংলাদেশের ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকার নিরাপত্তা, পরিবেশ এবং সার্বিক বিষয়ের যে নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে তা আঞ্চলিক সংহতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

৪.৯.১ রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

বাংলাদেশের ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবিক সহায়তাকারী সংগঠন রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিকতার হাতকে প্রসারিত করেছে। জাতিসংঘের জেনেভা কনফারেন্সে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে জরুরী সাড়াদানের নিমিত্তে IMO, UNHCR, OCHA এবং সভার আয়োজক কুয়েত ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রায় ৪৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান আহ্বান করে। প্রতিশ্রুতি সভায় ৩৫টি উৎস থেকে ৩৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান নিশিচত হয়। জাতিসংঘের (UNOCHA) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১০ নভেম্বর ২০১৭ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট অনুদানের পরিমান ১৪৩.১৯ মার্কিন ডলার যা মোট চাহিদার ৩৩%।

সারণি ১: চাহিদা মাফিক তহবিল গঠনের অগ্রগতি (১০নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)

খাতসমূহ	প্রয়োজনীয় চাহিদা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	প্রাপ্ত তহবিল (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	শতকরা অর্জিত হার
কমিউনিটিরি সাথে যোগাযোগ	৪.২২	০.০	০
শিক্ষা	২৬.৩২	০.০	০
খাদ্য নিরাপত্তা	৭৭.৫৪	১৮	২৩.২
স্বাস্থ্য	৪৮.৩৩	২.৬৪	৫.৫
আন্ত:সেক্টর সমন্বয়	৪.২	০.০৪	১
লজিস্টিক	৩.৭৫	১.০০	২৬.৭
পুষ্টি	১১.০৯	৭.০৪	৬৩.৫
সুরক্ষা	৩০.৬৯	৫.৯	১৯.১
উদ্বাস্তু সাড়াদান(বহু ক্ষেত্র)	৭.৫৫	২.৩	২৯.৯
আশ্রয়- খাদ্য ব্যতীত	৯০.৩৩	৮.৬	৯.৬
অবস্থান ব্যবস্থাপনা	৫৬.৪৭	০.০	০
WASH	৭৩.৫৯	১৬.৭	২২.৭
নির্দিষ্ট নয়	প্রযোজ্য নয়	৭৮	০
বিবিধ	প্রযোজ্য নয়	৩	০

উৎস: UN OCHA, 2017

সারণি ২: সংস্থা ভিত্তিক ত্রাণ (মার্কিন ডলার)

দাতা সংস্থা	সংগঠনের ধরন	খাত	পরিমান	চাহিদার শতকরা হার	প্রতিশ্রুতি
জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ	জাতিসংঘের নিজস্ব প্রকল্প, আইএমও,ডব্লিউ এফপি	পুষ্টি, লজিস্টিক,খাদ্য নিরাপত্তা	২২৪,৫৮৯	০.১%	০
রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট		আশ্রয়ণ, এনএফআই	১৫২,৩৯৩	০.০%	০
বেসরকারি সংস্থা/ ফাউন্ডেশন		বর্জ্য,স্বাস্থ্য, আশ্রয়ণ, এনএফআই	১,৭১৬,২৯৬	০.৪%	১,১৭০,৩৩১
শীর্ষ স্থানীয় তহবিল	সিইআরএফ	বিবিধ ক্ষেত্র,খাদ্য,সুরক্ষা, বর্জ্য,স্বাস্থ্য, আশ্রয়ণ	১৯,০১২,০৭৭	৪.৪%	০
জাতীয় সরকার	অস্ট্রেলিয়া,কানাডা,যুক্তরাজ্য,ডেনমার্ক ইত্যাদি	বর্জ্য, সুরক্ষা, আশ্রয়ণ, খাদ্য, স্বাস্থ্য, বিবিধ	১০৫,৯১৬,০২২	২৪.৪%	৭,২৩৮,৪৬৪
আন্ত: সরকার	এসিএফ, সলিডারিটিস	বর্জ্য, সুরক্ষা,পুষ্টি	১০,৯৬৩,১১৮	২.৫%	০

	ইন্টারন্যাশনাল,আইওএম, ডব্লিউ এফপি,প্রভৃতি				
স্থানীয় এনজিও	ব্রাক	বর্জ্য	১,২৭৫,৭৯২	০.৩%	০
মোট (০৯ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)					

উৎস: UN OCHA, 2017

৪.৯.২ কূটনৈতিক উদ্যোগ

রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতাকে UNHCR 'জাতিগত নিধন' হিসাবে উল্লেখ করেছে। রোহিঙ্গা সংকটে মিয়ানমারের পর বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। এই সমস্যায় বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে সংকট সমাধানে বিশ্বাস করে। তাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবিক কারনে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার ঘোষণা দেন এবং বিশ্ব প্রচার মাধ্যম তাঁকে "মাদার অব হিউম্যানিটি" উপাধিতে ভূষিত করে (UK based Channel 4 News, September 2017)।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশনে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ৫ দফা প্রস্তাব পেশ করেন (*Dhaka Tribune*, 25 June 2017)। প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ:

১. অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও 'জাতিগত নিধন' নিঃশর্তে বন্ধ করা;

২.অনতিবিলম্বে মিয়ানমারে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করা;

৩.জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান এবং এ লক্ষ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা;

৪. রাখাইন রাজ্য থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত সকল রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘর-বাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা; এবং

৫. কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার নিঃশর্ত, পূর্ণ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

কফি আনান কমিশন রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান জানায়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মিয়ানমারের ওপর অস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ অবরোধ ৩০ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করে। রোহিঙ্গা নির্যাতনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারে সামরিক সহায়তা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় এবং পুনরায় বিভিন্ন বিষয়ে অবরোধ আরোপের বিষয়টি বিবেচনায় আনে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২৪-২৭ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ মিয়ানমার সফর করে এবং মিয়ানমারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। সফরকালে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে নিরাপত্তা ও সীমান্ত সহযোগিতা বিষয়ে দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিজ দেশ মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন বিষয়ে দুই দেশ একমত প্রকাশ করেন এবং রাখাইন অঞ্চলে যতদ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন যাবত তাদের পরিচিতি সংকটে রয়েছে। অর্থনীতি ও সমাজে তাদের অবদান থাকা সত্ত্বেও তাদের উৎপত্তি, নৃতাত্ত্বিত ও পরিচিতি সংকট তৈরি হয়েছে। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদেরকে 'বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারের এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদেরকে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি, বরং তাদেরকে 'মিয়ানমান থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত মিয়ানমারের নাগরিক'(FDMN) হিসেবে নিবন্ধন ও ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন মানবাধিককার বিষয়ক সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হওয়ায় উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিতে মানবিকতা দেখিয়েছে। বাংলাদেশের অভিবাসন ও বহির্গমন বিভাগ বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নিবন্ধন করে রোহিঙ্গাদেরকে পরিচয়পত্র দিয়েছে। নিবন্ধিত রোহিঙ্গারা ত্রাণ, চিকিৎসা সহায়তা ও আশ্রয়, এই তিন ধরনের মানবিক সাহায্য পেয়ে থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের অন্তঃপ্রবাহ এবং স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর এর প্রভাব

৫.১ ভূমিকা

একটি উন্নয়নশীল ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হিসাবে বাংলাদেশ তার জণগনের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরনে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে এবং উন্নয়নের পথে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই জনবহুল দেশটিতে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আগমন, বিশেষ করে ২০১৭ সালের আগস্ট এর পর থেকে যে উদ্বাস্তুর ঢল বাংলাদেশে চলে আসে তা স্থায়ীভাবে এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং জাতীয় সম্পদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ তৈরি করেছে। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব- সংঘাত বৃদ্ধি একুশ শতকে বিশ্ব ব্যবস্থাপনার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে (Mohammad, 2011:402)। রোহিঙ্গা সমস্যা বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল উদ্বাস্তু সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (McDonald, 2018)। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত প্রায় পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা জীবন বাঁচাতে আরাকান রাজ্য থেকে সমুদ্র পথে ও পায়ে হেঁটে বাংলাদেশে প্রবেশ করে (BBC News, 2018)।

৫.২ বাংলাদেশ এবং রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকট বিশ্বের অন্যতম একটি দীর্ঘায়িত উদ্বাস্তু সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত । কেননা, বিগত ২০ বছর যাবত অবিরাম উদ্বাস্তুর ঢল বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করছে (Milton et al, 2017:2)। বাংলাদেশের সাথে ভাবত ও মিয়ানমারের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং দেশটির সাথে মিয়ানমারের ১৭০ মাইলের সীমান্ত রয়েছে (James, 2006:120)। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী আরাকান প্রদেশের মংডু জেলায় রোহিঙ্গাদের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বাস করে (Galache, 2017)। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট এর পরবর্তি সময়ে মিয়ানমার থেকে ৭ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আগমন করে যা ইতোমধ্যে বসবাসকারী রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে (McDonald, 2018)। রোহিঙ্গারা স্থল ও সমুদ্র পথে বাংলাদেশে আগমন করে। এর ফলে তাদের প্রকৃত সংখ্যা অনুমান নির্ভর থেকে যায। সরকারের হাতে যে তথ্য আছে তা কেবল ক্যাম্পে অবস্থানরত উদ্বাস্তুদেরকে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

৫.৩ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু শিবির

কক্সবাজারের নয়াপাড়া উদ্বাস্তু ক্যাম্পের ২৩ বছরের একজন নারী এক স্বাক্ষাতকারে বলেন, " Life is not well, we're suffering well" (Frotiers-Holland, 2002:12) । রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের শোচনীয় অবস্থায় সর্বপ্রথম সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে বাংলাদেশ এবং তাদের বসবাসের জন্য নিজ ভূ-খন্ডে ক্যাম্প তৈরী, খাদ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে (UNHCR, 2018b)। ২০১৭ সালের শেষের দিকে সহিংসতা বৃদ্ধি পরবর্তি সময়ে অপ্রতুল আয়তন ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু কক্সবাজারের উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোতে বসবাস শুরু করে (UNHCR, 2018b)। ২৫ আগস্ট ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ এর সহিংস ঘটনার আগে বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে দুটি ক্যাম্পে ৩৩,১৩১ জন এবং বেসরকারিভাবে বিভিন্ন শহর ও গ্রামে ২ থেকে ৫ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করে আসছিল (Milton et al, 2017:2)।

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোর বার্ষিক সম্ভাব্য ব্যয় প্রায় ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (ICG, 2018:6)। ক্যাম্প তৈরিতে ব্যাপকভাবে বন উজার করার কারনে বর্ষা ঋতুতে ভূমি ধ্বস এবং মাটি ক্ষয় দেখা দেয়। কেননা, কক্সবাজারের অধিকাংশ উদ্বাস্তু ক্যাম্প পাহাড়ের উপর তৈরী । জাতিসংঘের ২০১৮ সালের এক রিপোর্টে দেখানো হয় যে, প্রায় ১ লাখ উদ্বাস্তু স্বাস্থ্য ও পাহাড় ধ্বসের হুমকির মধ্যে রয়েছে (Miles, 2018)। কেন্দ্রীয় সরকার ও আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীগুলো সাথে সমন্বয় করে স্থানীয় সরকার ঘূর্নিঝড় ও ভূমি ধ্বস নিয়ে কাজ শুরু করে (UNDP & UN Women, 2017:10)। সারণি- ৩ এ ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বসবাসকারী উদ্বাস্তুর সংখ্যা দেখানো হয়েছে এবং সারণি- ৪ এ ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট এর পরবর্তি সময়ে উদ্বাস্তুর বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-৩: ২০১৫ সাল পর্যন্ত মিয়ানমার থেকে আগত নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উদ্বাস্তুর সংখ্যা

চলক	ফ্রিকোয়েন্সি
উদ্বাস্ত ক্যাম্প	২
বৈধ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু	সংখ্যা
নয়াপাড়া ক্যাম্প, টেকনাফ	১৯,৩১১

কুতুপালং ক্যাম্ট, উখিয়া	১৩,৮২০
অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু	সংখ্যা
লেডা ক্যাম্প,টেকনাফ	১৫,০০০-২০,০০০
সালামপুর, টেকনাফ	৮,০০০-১০,০০০
কুতুপালং ক্যাম্প সংলগ্ন,উখিয়া	৪০,০০০-৫০,০০০
কক্সবাজার ও অন্যান্য জেলায় বসবাস	৩০০.০০০

উৎস: উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের অফিস, ২০১৫।

সারণি-৪: কক্সবাজারের বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর পরিসংখ্যান

অস্থায়ী বাসস্থান/উদ্বাস্তু ক্যাম্প	আগস্ট অন্তঃপ্রবাহের পূর্বে	২০১৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত
কুতুপালং, বালুখালী	১১৩,৬০৬	৬৩১,৪৭০
লেডা এম এস	১৪,২৪০	৩৩,৫৪০
নয়াপাড়া আর সি	১৯,২৩০	২৭,২২০
নয়াপাড়া	-	৪১,০১০
হাকিমপাড়া	১৪০	৩১,৯১০
আলীখালী	১০০	৯,৫০০
উনচিপ্রাং	-	২২,২১৫
জামতলি	৭২	৪৯,৪০০
বাগোনা/পতিবনিয়া	৫০	২১,৮৪০
চাকমাকুল	-	১৩,১৭০
শামলাপুর	-	১০,২১০
জাদিরমূড়া	-	১৪,২৭০
স্থানিক লোকালয়ে	-	৬,৬৫৩
কক্সবাজারের বিভিন্ন অঞ্চলে	৬৫,০৮০	-
মোট রোহিঙ্গা	২১২,৫১৮	৯১২,৪০৮

উৎস: Situation Report: Rohingya Crisis. Inter Sector Coordination Group, Cox’s Bazar, 31 July, 2019.

কক্সবাজার জেলার মোট আয়তন ২৪৯১.৮৬ বর্গ কিলোমিটার এবং ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে জেলার মোট জনসংখ্যা ২,২৮৯,৯৯০ জন (Deputy Commissioner's Office, 2018)। উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলো জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে স্থানিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল নয়। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আগমনের কারনে ঐসব এলাকার মানুষের জীবনযাপন ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেই হারে মানুষের আয় বৃদ্ধি না পাওয়ায় রোহিঙ্গা বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়েছে (Milton et al, 2017:6)। স্থানিক জনগোষ্ঠী মিয়ানমারের নিপীড়িত রোহিঙ্গাদেরকে নিজ এলাকায় উদ্বাস্তু হিসেবে স্বাগত জানালেও দশকের পর দশক উদ্বাস্তু প্রবাহ বৃদ্ধি এবং ২০১৭ সালের অতিপ্রবাহ স্থানিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি করেছে (McDonald, 2018)।

নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ক্যাম্প এবং ক্যাম্পের বাহিরে বসবাসকারী রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের চলাচলে বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। উদাহরণসরূপ: রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের বাহিরে যেতে হলে অনুমতিপত্র নিতে হয়, কেননা তাদের ক্যাম্পের বাহিরে চলাচলের স্বাধীনতা নেই (Milton et al, 2017:6)। সরকার একটি বেসামরিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সাহায্য সংস্থাগুলোকে এই কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জন্য কাজ করতে হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উদ্বাস্তু ক্যাম্পের সার্বিক তত্ত্বাবধান, নিরাপত্তা, চলাচলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্যাম্পে অবৈধ কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে (Karim, 2017)। বাংলাদেশ পুলিশ এবং আনসার বাহিনী কক্সবাজার জেলার ক্যাম্প এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। কক্সবাজার অঞ্চলে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং আবাসনের সংকট বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার কক্সবাজারে ৩ হাজার একর জায়গায় উদ্বাস্তুদের বসবাসের জন্য ক্যাম্প তৈরি করেছে (Solomon, 2018)। বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত উদ্বাস্তু বসবাসের জন্য সংকীর্ণ জায়গায় অস্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করছে এবং খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা দিয়ে আসছে (OCHA, 2017)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গার জন্য দুই ডোজ ডিপথেরিয়ার ভেক্সিন দিয়েছে এবং ৩.৫ লাখ এর বেশি রোহিঙ্গা শিশুকে ভেক্সিনের আওতায় নিয়ে এসেছে (Miles, 2018)। এছাড়াও WHO ২৫০০ ডোজ

বিষক্রিয়ালোপকারী ঔষধ চিকিৎসাপত্র হিসাবে সরবরাহ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার দাতাগোষ্ঠীর সাথে সমন্বয় করে ক্যাম্প এলাকার বন্যা, ভূমিধ্বস ও পরিবেশগত সার্বিক বিপর্যয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নারী ও শিশূ সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে (McDonald, 2018)। UNHCR সাহায্য সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় করে পূর্বে আসা রোহিঙ্গাদের সাথে ২০১৭ সালে আসা রোহিঙ্গাদেরকে নিবন্ধিত করাসহ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে কাজ করছে (Kiragu, Rosi & Morris, 2011:2) । জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা যুগ্মভাবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে উদ্বাস্তুদের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদানে কাজ করছে (OCHA, 2017)। UNHCR এর মতে, সাহায্য সংস্থাগুলো উদ্বাস্তু ও স্থানিক জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক চাহিদা নিশ্চিতকরণ, মানবিক সংকটের টেকসই সমাধান ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে (UNHCR, 2018)।

৫.৪ স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাব

পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ঘটমান সংকটের কোনো না কোনো প্রভাব থাকে। রোহিঙ্গা সংকটের প্রেক্ষাপটে উদ্বাস্তু ক্যাম্পের অবস্থান বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, স্বাস্থ্যগত, পরিবেশগত, লিঙ্গাগত ও নিরাপত্তাজনিত ব্যাপক ও বিস্তর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৫.৪.১ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের সামাজিক প্রভাব

সামাজিক প্রভাবের আওতায় স্বাস্থ্যগত সমস্যা, আইনগত বিপর্যয় এবং স্থানিক জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের বোঝা হিসেবে বিবেচনা করছে। বাংলাদেশ ইতোপূর্বে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু গ্রহণ করে চাপে ছিলো। কিন্তু ২০১৭ সালে ব্যাপক হারে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু প্রবেশ করার পরে অত্র অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। উদ্বাস্তুদের অতিচাপে এখানকার সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ভাষাগত কাঠামোর অবমূল্যায়নের মুখে পড়ে স্থানিক জনগোষ্ঠী (OCHA, 2018)। উখিয়া এবং টেকনাফের ক্যাম্পগুলোতে, যেখানে অধিকাংশ রোহিঙ্গা বসবাস করছে,

তার মোট আয়তন ৬৫১ বর্গ কিলোমিটার। এই দুই উপজেলায় ১০ লাখের বেশি উদ্বাস্তু বসবাস করছে (Mahmud, 2017)। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জন্মহার বাংলাদেশীদের চেয়ে অনেক বেশি (Alam, 2018a)। মানবিক সহায়তাদানকারী সংগঠনগুলোর হিসেবে রোহিঙ্গা নাররিা ২০১৮ সালেই প্রায় ৪৮ হাজার শিশু জন্ম দিয়েছে যা স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর ভবিষ্যতে আরো চাপ তৈরি করবে বলে মনে করা হয়। প্রতি বছর প্রায় ৪৫ হাজার রোহিঙ্গা শিশু জন্মগ্রহণ করছে (দৈনিক প্রথম আলো,২৫ মে ২০২২:২)।

দাতাগোষ্ঠী যখন উদ্বাস্তুদের জন্য রিলিফ কার্যক্রম পরিচালনা করে তখন স্থানিক বাংলাদেশী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়, কেননা তাদের জন্য খুব কম সাহায্য বরাদ্দ দেয়া হয় (International Rescue Committee, 2014:25; Janny & Islam, 2015:97; UNDP & Un Women, 2017)। সামাজিক প্রভাব উদ্বাস্তু এবং স্থানিক জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সুসম্পর্ককে শত্রুতায় পরিনত করেছে। এছাড়া রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক অপকর্ম যেমন: অবৈধ অস্ত্রের চালান, মাদকদ্রব্য পাচার, মানব পাচার, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং বেশ্যাবৃত্তির মতো সামাজিক ঘৃনিত কর্মকান্ডের প্রকোপ কক্সবাজার জেলায় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (Uddin, 2012:129)। রোহিঙ্গারা মাদক চোরাচালান ও বেশ্যাবৃত্তিতে নারীদেরকে ব্যবহার করছে এবং এটিকে সহজে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছে যা বাংলাদেশের মতো একটি ধর্মভীরু সমাজ ব্যবস্থাকে স্থবির করে দিয়েছে (BBC, 2017)। অর্থের লোভ অথবা অভাবের কারনে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের অনেকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে (Datta, 2015:136-137)।

২০১৭ সালের নভেম্বরে বিবিসি সংবাদ মাধ্যমে এক স্বাক্ষাতকারে হালিমা নামক এক রোহিঙ্গা নারী বাংলাদেশে আসার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলে আসল সত্য উন্মোচিত হয়ে যায়। সে বাংলাদেশ পুলিশের মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার পূর্বে প্রায় দুই মাস বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু টাকা বা সহায়তার অভাবে পুনরায় সে বেশ্যাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে (BBC, 2017)। রোহিঙ্গাদের মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতি ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিরোধী কর্মকান্ড স্থানিক জনগোষ্ঠীর মাঝে অসন্তোষ তৈরি করে (Lee,

2005:77)। এছাড়াও স্থানিক জনগোষ্ঠী ও রোহিঙ্গাদের মাঝে কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে প্রতিযোগিতা বিরাজমান। IAWG আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ক্যাম্পের নারী ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অনুরোধ জানিয়েছে। দ্রুততার সাথে নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং যৌনবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তা ঘনবসতিপূর্ণ উদ্বাস্তু শিবিরের নারীদের ওপর মহামারি রূপ ধারণ করতে পারে। বাংলাদেশে আসার পূর্বে বহু নারী মিয়ানমারে ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে, যাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের মাঝে যোনবাহিত রোগ (STD) এর বিস্তার স্থানীয়দের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে (IAWG, 2018)।

সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি স্থানিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক- সাংস্কৃতিক জীবন এই সংকটের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেমন: কিছু রোহিঙ্গা নারী স্থানিক জনগোষ্ঠীর পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার আইনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা নারীদেরকে বিবাহ নিষিদ্ধ করে রেখেছে। এভাবে পাশাপাশি বসবাসকারী দুটি সম্প্রদায়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে নির্দিষ্ট করে রেখেছে। এক্ষেত্রে পুলিশ অত্যন্ত সচেতননভাবে আইনটি প্রয়োগ করছে (SBC News, 2017)। সরকারের কঠোর নীতির কারনে উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোতে রোহিঙ্গাদের মধ্যে শত্রুতা, বিশ্বাসহীনতা এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কক্সবাজারের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং পরিবেশের চরম অবনতি নিয়ে পুলিশ বাহিনী ও জেলা প্রশাসন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন (Shyamol, 2017)।

বহু সংখ্যক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ক্যাম্পর বাহিরে স্থানিক জনগোষ্ঠী সাথে বসবাস করছে এবং তারা বাংলাদেশী নাগরিক হিসাবে দাবি করে স্থানিক লোকদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করছে, ভোটার হয়েছে ও অবৈধভাবে বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে (Datta, 2015:141)। প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশী পাসপোর্ট ব্যবহার করে সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কাজের জন্য চলে গেছে যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক (*The Daily Star*, 2017)। আন্তর্জাতিক ইসলামী চরমপন্থী সংগঠনগুলো রোহিঙ্গাদেরকে ‘মানবিক জিহাদ’ কার্যক্রমের আওতায় তাদের দলে

ভেড়াতে পারে, যা এ অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করবে (BIPSS, 2017)।

৫.৪.২ রোহিঙ্গাদের মাঝে জেন্ডার বৈষম্য

রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে স্থানিক জনগোষ্ঠীর ধারণা হলো, তারা অশিক্ষিত, রুঢ়,সন্ত্রাসী মনোভাব সম্পন্ন এবং অধিক মাত্রায় উগ্র স্বভাবের (UNDP & UN Women, 2017:2)। রোহিঙ্গাদের উগ্রবাদী স্বভাবের অন্যতম উদাহরন হলো তাদের মধ্যে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে লিঙ্গ বৈষম্য ও সাম্যের অনুপস্থিতি। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য হলো " কোনো ব্যক্তির লিঙ্গ দেখে তাকে সহিংসতার জন্য টার্গেট করা এবং তাকে সমাজে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য বাধ্য করা" (Benjamin and Fancy, 1998:14)। রোহিঙ্গা যুবতি নারীরা তাদের নিজস্ব কমিউনিটির মানুষের দ্বারা উদ্বাস্তু ক্যাম্পে যৌন নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে (Alam, 2018b)। এছাড়া বাল্য বিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়ার প্রবনতা রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রবল। রোহিঙ্গাদের ব্যবহারের টয়লেট ও পানির উৎস অনেক দূরে হওয়ায় নারী ও শিশুরা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে (Akhter & Kusakabe, 2014)। ক্যাম্পগুলোতে পুরুষেরা অলস বসে থাকার কারনে তারা হতাশায় ভোগে যা পরিবারের নারী ও অন্যান্য সদস্যদের প্রতি সহিংতা প্রকাশের অন্যতম কারন। অদক্ষতা ও ক্যাম্পের বাহিরে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞার কারনে রোহিঙ্গা পুরুষেরা ঘরে সময় অতিবাহিত করে। নারীরা প্রয়োজনে বাহিরে যায় এবং অবৈধ সম্পর্কে জড়ায়, এতে পরিবারগুলোতে অশান্তি তৈরি হয় (Akhter & Kusakabe, 2014:238)। এছাড়া যেখানে রোহিঙ্গা নারীরা সামান্য মজুরিতে কাজ করে সেখানে তারা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়।

৫.৪.৩ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের রাজনৈতিক প্রভাব

রোহিঙ্গা সংকট শুরু হওয়ার প্রথম দিকে বাংলাদেশ নিজ ভূ-খন্ডে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে চায়নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলের চাপে এবং দাতাগোষ্ঠীর সহায়তার আশ্বাসের প্রেক্ষিতে সরকার উদ্বাস্তু গ্রহণে দৃষ্টান্তমূলক নজির স্থাপন করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এই উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশে সরকার

কূটনৈতিক সমঝোতায় আসার প্রচেষ্টা দেখিয়েছে। বাস্তবে সংকটের সমাধান হয়েছে খুব সামান্য। কিন্তু ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা সংকট পূর্বের সেই কূটনৈতিক প্রক্রিয়াকে আরো স্থবির করে দেয়। বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় (Alam, 2018a)। যাই হোক, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ সালে উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার পরবর্তি দুই বছরের মধ্যে সকল রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। মিয়ানমার সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা, রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব ও মানবাধিকার নিশ্চিত না হওয়া এবং রোহিঙ্গাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিয়ানমারে না পাঠানোর বিষয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আপত্তির প্রেক্ষাপটে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যায় (Alam, 2018a)।

সাধারণভাবে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু গ্রহণে সরকারের প্রতি দেশের জনগনের সম্মতি ছিল এবং ২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারকে একটি সমাধানের প্রক্রিয়া হাতে নেওয়া রাজনৈতিকভাবেই দরকার ছিল (Idris, 2017:2)। এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার ও রাজনীতিবিদগন তাদের নিজ রাজনৈতিক স্বার্থে রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করতে পারে যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় (BIPSS, 2017:6)। রোহিঙ্গা সংকটের কারনে বাংলাদেশের সাথে তার নিকটতম দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও চীনের সম্পর্কের অবনতির হতে পারে এবং এর ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ ক্ষতির সম্মুক্ষীন হতে পারে, যেহেতু মিয়ানমারে ভারত এবং চীনের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে (BIPSS, 2017:7)। ফলে এই অঞ্চলে নতুন কূটনৈতিক মেরুকরন তৈরি হতে পারে এবং বাংলাদেশে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

৫.৪.৪ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের অর্থনৈতিক প্রভাব

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্ভর করে চাহিদা ও যোগনের ভারসাম্য এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রবেশাধিকারের ওপর ভিত্তি করে। রোহিঙ্গা সংকট স্থানীয় অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং আরো বহুমুখি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, যখন একটি বৃহৎ কর্মহীন

জনগোষ্ঠী হঠাৎ করে একটি ভূ-খন্ডে চলে আসে (BIPSS, 2017:4)। কর্মহীন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যখন ক্যাম্পের বাইরে কাজে বের হয় এবং স্বল্প মজুরীতে কাজ করে তখন সেখানকার সমাজ জীবনে এক ধরনের অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলো অনুন্নত এলাকায় অবস্থিত, যেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশ গরিব এবং তারা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে দিনমজুররে কাজ করে (Baldwin and Marshall, 2018)। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা কম মজুরিতে কাজ করে বিধায় স্থানীয়দের সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে এবং স্থানিক শ্রমিকদের অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে স্থানীয়রা পাঁচশত টাকায় কাজ করছে সেখানে রোহিঙ্গাদের দিয়ে তিনশত টাকায় কাজ করিয়ে নেয়া যাচ্ছে। ফলে যারা স্থানীয় শ্রমবাজারে কাজ করাচ্ছে তারা রোহিঙ্গাদের দিকে অধিক মনোযোগী। এর ফলে স্থানীয় চড়ামূল্যের বাজারে স্থানিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন আরো কঠিনতর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রের পরিধি সংকুচিত হওয়ার প্রেক্ষিতে স্থানিক শ্রমিকেরা তাদের স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে জীবনযাপনের ব্যয় নির্বাহ করছে। তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে রোহিঙ্গাদের মতো অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে (UNDP & UN Women, 2017:7)। যখন গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আয় হ্রাস পায় এবং আয় বৃদ্ধির আশায় তারা অন্যত্র চলে যায় তখন সেটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য হুমকিস্বরূপ (Yasmin, 2017:417)।

বাংলাদেশ সীমিত সম্পদ, অধিক জনসংখ্যা এবং সীমিত কৃষি জমি সম্পন্ন একটি ছোট দেশ। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের অন্তঃপ্রবাহ এবং তাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠী ও উচ্চ জন্মহার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ছিলো ২০২৯.৬০ মার্কিন ডলার যা বিশ্ব গড়ের তুলনায় শতকরা ৮ এর সমান (Trading Economics n.d.)। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব মতে, উদ্বাস্তু আগমনের কারনে আগস্ট ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মার্চ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উখিয়া ও টেকনাফ উপদ্বীপের কমপক্ষে ১০০ হেক্টর ফসলি জমি ধ্বংস হয়েছে এবং উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প নির্মাণ ও সহায়তাকারী সংস্থাগুলোর বাড়ি-ঘর নর্মিাণের জন্য আরো ৭৬ হেক্টর আবাদি জমি দখল করা হয়েছে (UNDP,

2018:85)। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আরো একটি হিসাব অনুযায়ী ২০১৭ সালের শীতকালীন রবি মৌসুমে ফসল তোলার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রোহিঙ্গা উপস্থিতির কারনে ১৯ হাজার টন ফসলের ক্ষতি হয়েছে। আবাদী জমিতে উদ্বাস্তু ক্যাম্প স্থাপনের কারনেউখিয়ার থাইংখালীতে স্থানিক জনগোষ্ঠীর আবাদী চাষের জমি কমে যায় (ACAPS and NPM, 2018)। বহু সংখ্যক পানের বরজ ও সবজি বাগান ধ্বংস হয়ে গেছে।

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকট স্থানীয় কৃষি ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করেছে। মানবিক সহায়তাকারী সংগঠনগুলো স্থানীয় কৃষকদের খাদ্যশস্য, বীজ এবং আরো বেশকিছু কৃষি উপযোগী জিনিসপত্র দিয়ে সহায়তা করছে। কিন্তু উদ্বাস্তুরা স্থানীয় বাজার থেকে তা ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছে। সবজি বাজারে অধিক চাহিদা তৈরি হওয়াতে টেকনাফ ও উখিয়ার বাইরে থেকে যোগান দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সবজির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদক ও সরবরাহকারীরা উপকারভোগী হচ্ছে, কিন্তু স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে অত্র অঞ্চলে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েই চলবে (UNDP, 2018:86)।

কক্সবাজার অঞ্চলের রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকারের বাজেটের ওপর চাপ তৈরি হয়েছে (Alam, 2018a)। কক্সবাজার বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্র, কিন্তু উদ্বাস্তু সংকট এই শিল্পের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে (Cookson, 2017b)। উদ্বাস্তু সংকটের পর থেকে নিরাপত্তাসহ বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করায় পর্যটন ব্যবসায় ভাটা পড়ে (Khan, 2017:25)। ট্যুর এজেন্সিগুলোর ভাষ্য মতে, ২০১৭ সালের মৌসুমে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন পর্যটক কমে গেছে। সেন্টমার্টিন ভ্রমন, বাংলাদেশ- মিয়ানমার আন্তঃবানিজ্য ও নাফ নদীতে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার কারনে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর চাপ বেড়েছে (UNDP & UN Wommen, 2017:9)। উদাহরনস্বরূপ, টেকনাফ উপজেলায় রোহিঙ্গা উপস্থিতির কারনে সেখানকার যোগাযোগের ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমুদ্র কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের স্থবিরতাকে উল্লেখ করা যায়। অপরদিকে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প তৈরিতে ব্যাপকভাবে বন উজার করা হয়। এর ফলে স্থানিক জনগোষ্ঠীর জ্বালানী কাঠ ও বাড়ি

নির্মানের কাঠের অভাব দেখা দেয় এবং বাগানের ফলমূল ও অন্যান্য বন্য উপকরন সংগ্রহের সুযোগ সীমিত হয়ে যায় (UNDP & UN Wommen, 2017:7)।

কক্সবাজারের মোট কর্মসংস্থানের শতকরা ২৪ ভাগ মৎস আহরন, শুটকি উৎপাদন, হ্যাচারি এবং চিংড়ির রেনু সংগ্রহ ও চাষের সাথে সম্পৃক্ত। টেকনাফে মূল কর্মক্ষেত্র হলো মৎস্য আহরন। সেখানকার প্রতি তিন জনের একজন মৎস্য আহরনের সাথে যুক্ত রয়েছে (BBS, 2018)। নাফ নদীর ওপর নির্ভরশীল টেকনাফের মৎস্য উৎপাদনের পরিমান সামুদ্রিক মৎস্য আহরনকারী মহেশখালী ও কুতুবদিয়ার চেয়ে অনেক কম। নিরাপত্তা ও সীমান্ত কেন্দ্রিক নিষেধাজ্ঞার কারনে ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে নাফ নদীতে মৎস আহরন বন্ধ ছিল। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশ হাজার মৎস্যজীবী ও তাদের পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব তৈরি করেছে (UNDP, 2018:87)। তখন রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের সাথে প্রতিযোগিতা করে অনেক জেলে বাধ্য হয়েছে দিন মজুর হিসাবে কম মজুরিতে কাজ করতে।

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জন্য বৈদেশিক সাহায্য এবং সহায়তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন দাতা সরকার, এনজিও এবং UNHCR উদ্বাস্তুদের সাহায্য করেছে, এর ফলে স্থানিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে (Parnini, 2013:288)। রোহিঙ্গা আগমনের পর স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে (Khatun, 2017:24)। বাংলাদেশী অনেক শ্রমিক আকর্ষণীয় বেতনে উন্নয়ন অংশীদার ও আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তাকারী সংস্থায় চাকরি পেয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও শ্রমের মূল্য কমে যাওয়ায় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ উদ্বাস্তু গ্রহণকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভঙ্গুর করে দিয়েছে। এই ভঙ্গুর বাস্তবতার মাঝেও কিছু সংখ্যক স্থানিক জনগোষ্ঠী সুবিধা গ্রহণ করেছে। যেমন: বড় বড় কৃষক কম মজুরিতে শ্রমিক পেয়েছে, এতে উৎপাদন ব্যয় কমেছে এবং তারা বেশি লাভবান হয়েছে। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির কারনে পন্য উৎপাদনকারী এবং বিপননকারী উভয়ই প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছে। এই অবস্থায় এক মিলিয়ন উদ্বাস্তুর ভোগ্যপন্য যোগান দিতে বিপুল পরিমান কাঁচামাল বা রশদ লেগেছে যা ব্যবসায়ীদের

উপার্জন বাড়িয়ে দিয়েছে। পুরাতন বাজারগুলোতে অধিক চাপ বেড়েছে এবং নতুন নতুন বাজার তৈরি হচ্ছে, ফলে বাড়তি চাপ কমেছে (UNDP, 2018:85)।

৫.৪.৫ স্বাস্থ্য খাতে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের প্রভাব

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকট শুরু হলে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলো চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অপর্যাপ্ততার কারনে সংক্রামক ব্যাধিসহ অন্যান্য রোগের বিস্তার বৃদ্ধি পেতে পারে, এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে (Alam, 2018a)। যে সকল রোহিঙ্গা নিবন্ধিত নয় তারা রোগাক্রান্ত এবং তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক ব্যাধি, যেমন: হেপাটাইটিস বি, যক্ষ্মা, HIV ,চর্মরোগ ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বাংলাদেশে ছড়াচ্ছে (Masud et al, 2017:21)। BIPSS এর এক জরিপে দেখানো হয় যে, সংক্রামক ব্যাধি ক্যাম্পগুলোর স্বাস্থ্যখাতকে এলোমেলো করে দিতে পারে এবং ক্যাম্পের বাইরে উদ্বাস্তুদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের জন্য স্থানিক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে (BIPSS, 2017:3)।

পরিবেশ দূষণের কারনে উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও স্থানিক জণগনের মাঝে রোগের বিস্তার নিয়ে বহু গবেষক ও সংস্থা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে (Haque, 2016:865;Khatun, 2017:28; Janny & Islam, 2015:97)। তারা উন্মুক্ত পায়খানা ও পয়ঃনিষ্কাষণ নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন, কেননা এগুলোর সাথে পানিবাহিত রোগ –জীবানু উদ্বাস্তু ও স্থানিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এর ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয় এবং শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। পরিবার পরিকল্পনার অভাব, উচ্চ জন্ম ও শিশু মৃত্যু হার, বাল্য বিবাহ, সংক্রামক যৌন রোগ বিষয়ে সচেতনতার অভাব প্রভৃতি কারনে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো স্বাস্থ্য ঝুকিতে রয়েছে (Masud et al, 2017:23; Datta, 2015:139)। মাদক চোরাচালানে রোহিঙ্গাদের সংশ্লিষ্টতার কারনে ক্যাম্পগুলোতে মাদকাসক্তি ও বিভিন্ন মাদক সম্পর্কিত রোগ, যেমন: HIV, হেপাটাইটিস এর দ্রুত বিস্তার ঘটছে (Parnini, 2012:236) ।

৫.৪.৬ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের পরিবেশগত প্রভাব

বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলবর্তী দুর্যোগ প্রবন একটি রাষ্ট্র। ইতোমধ্যে পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শোভামন্ডিত কক্সবাজারে দশকের পর দশক ধরে উদ্বাস্তু আগমন ও বসবাসের ফলে সংরক্ষিত বনভূমি উজার করে ক্যাম্প নির্মানের কারনে বাংলাদেশকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে (Khatun, 2017:23)। রোহিঙ্গা উপস্থিতির কারনে বিশুদ্ধ পানির অভাব এবং সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অতিরিক্ত উদ্বাস্তুর চাপে দ্রুত অত্র অঞ্চলে সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ফুরিয়ে আসছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য অদূর ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক সম্পদের অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে (Ahmed, 2018)। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের মতে উদ্বাস্তুদের জন্য প্রায় ৪ হাজার একর বনভূমি ধ্বংস হয়ে গেছে, পানির স্তর নিচে নেমে গেছে, শুকনো মৌসুমে টিউবওয়েলে পানি আসছে না। বর্ষাকালে ভূমিধ্বসের হুমকি তৈরি হচ্ছে। যে সকল স্থানে এক সময় ফলের গাছসহ অন্যান্য কাঠের গাছ ছিলো, সেগুলো উদ্বাস্তুরা জ্বালানী এবং ঘর-বাড়ি নির্মানের জন্য উজার করে দিয়েছে, এক সময়ের ঘন বনে ঘেরা পাহাড় এখন খা খা মরুভূমি।

টেকনাফ বন্যপ্রাণি অভয়াশ্রম এর নির্ধারিত ২৮,৬৮৮ একর জায়গা উদ্বাস্তু ও স্থানিক জনগোষ্ঠীর মাত্রাতিরিক্ত বন্য সম্পদ আহরনের ফলে মহা সংকটে পড়েছে (Alam et al, 2014:233)। কুতুপালং বাজার থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প তৈরি হয়েছে যার সম্পূর্ণটাই পূর্বে বন ছিলো। উদ্বাস্তুরা বনের গাছ এবং পাহাড় কেটে সমভূমি বানিয়ে বাসস্থান নির্মান করছে। কক্সবাজার বন বিভাগের (দক্ষিণ) তথ্য মতে, উখিয়া উপজেলায় ১০ হাজার একর জায়গায় রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প রয়েছে। পূর্বে আসা এবং ২০১৭ সালে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য অতিরিক্ত ৪ হাজার একর ভূমি ক্যাম্প হিসেবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় (Aziz, 2018)। বনভূমি উজারকরণের কারনে স্থানিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিয়েছে, তারা বিশুদ্ধ পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে (UNDP & UN Women, 2017:9)। উদ্বাস্তু সংকট কক্সবাজারের জীববৈচিত্র এবং সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে

(Imran & Miah, 2014:239)। ইতোমধ্যে এখানকার বাস্তুতন্ত্র ভেঙ্গে পড়েছে। বন্য প্রাণি, বিশেষ করে ক্যাম্প এলাকায় হাতির অভয়ারন্য ছিলো, কিন্তু বর্তমানে এখানে হাতি আসতে পারছে না। হাকিমপাড়া উদ্বাস্তু ক্যাম্প এলাকায় নলকূপে পানি আসছে না, কেননা এখানে বন সম্পূর্ণ উজার করা হয়েছে (Ahmed, 2018)। WHO এর এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, টিউবওয়েলের নিকটবর্তী এবং পাহাড়ের ঢালে পায়খানা রয়েছে, যেখান থেকে প্রাকৃতিকভাবেই পানিতে দূষিত জীবানু প্রবেশ করছে। ফলে ডায়রিয়া ও কলেরার মতো পানিবাহিত রোগ খাবার থেকে ছড়িয়ে পড়ছে (Ahmed, 2018)। এভাবে উদ্বাস্তু সংকট বাংলাদেশের পুরো পরিবেশকে প্রভাবিত করছে যা ইতোমধ্যে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন (BIPSS, 2017:6)।

বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র এলাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার কারনে স্থানীয় উদ্ভিদকূল এবং জীববৈচিত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। রোহিঙ্গাদের বাসস্থান সংস্থানের কারনে স্থানীয় ভূমি এবং কৃষি জমি ব্যবহারের ওপর তাৎক্ষনিক প্রভাব পড়েছে। অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কেটে উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প নির্মান করায় স্থানিক জনগোষ্ঠী ও উদ্বাস্তুদের জন্য পাহাড় ধ্বস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টির হুমকি তৈরি হয়েছে (Zaman, 2019)। উদ্বাস্তুদের জন্য মাত্রাতিরিক্ত আশ্রয় শিবির নির্মানের কারনে স্থানিক কৃষি জমি, সবজি বাগান, পুকুর এবং বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়েছে (UNDP & UN Women, 2017:5)। বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গার যাতায়াত, সাহায্য সংস্থা ও মানবিক সহায়তাকারী গাড়ি যাতায়াতের কারনে স্থানীয় রাস্তাগুলোর বেহাল দশা তৈরি হয়েছে।

৫.৪.৭ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের নিরাপত্তাজনিত প্রভাব

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু উপস্থিতির কারনে কক্সবাজারের স্থানিক জনগোষ্ঠী ও সরকারের অন্যতম উদ্বিগ্নতার বিষয় হলো নিরাপত্তা। এই মানবিক সংকট কোনো স্বাভাবিক ও ক্ষণস্থায়ী সংকট নয় বরং এটি এখন একটি স্থায়ী সংকটে পরিনত হয়েছে যা পুরো বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রোহিঙ্গা সংকটের জন্য হুমকির মুখে রয়েছে (BIPSS, 2017; Ministry of Foreign Affairs, 2014:2; Parnini, Othaamn &

Ghazali, 2013:141)। রোহিঙ্গাদের স্বশস্ত্র সংগঠন ARSA ইতোমধ্যে তাদের শক্তিমত্তা দেখিয়ে রোহিঙ্গাদেরকে জিহাদি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করেছে, তারা অস্ত্র চোরাচালান, মাদক চোরাচালান এবং বর্ডার এলাকায় যুদ্ধ করার কাজে ব্যবহার করছে। এছাড়া সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি ও ক্যাম্পে ভীতি ছড়ানোর কাজে উদ্বাস্তুদেরকে ব্যবহার করার কারনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে (Haque, 2016:863; ICG,2018:8। উগ্রবাদী ইসলামী সন্ত্রাসী সংগঠন আল-কায়েদা বাংলাদেশী মুসলমানদের কাছে রোহিঙ্গাদেরকে সহায়তা প্রদানের জন্য আহ্বান করেছে যাতে তারা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে (Alam, 2018b)। এছাড়া আরো কয়েকটি স্বশস্ত্র সংগঠন যেমন: RSO(Rohingya Solidarity Organisation) আরাকান ইসলামিক ফ্রন্ট, রোহিঙ্গা প্যাট্রিওটিক ফ্রন্ট, বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার সীমান্তে কার্যক্রম পরিচালনা করছে (Milton et al., 2017:7)। বাংলাদেশের মধ্যে এবং সীমান্ত এলাকায় রোহিঙ্গাদের অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য হরকত-উল- ইসলাম ও জামায়াতে ইসলাম তবিল সংগ্রহের কাজ করছে (Ullah, 2011:156)। উপর্যুক্ত কার্যক্রম ছাড়াও আরো অনেক অজ্ঞাত কর্মকান্ড যে চলছে না তা অস্বীকার করা যায় না।

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আগমন ও রাখাইনে উত্তরোত্তর নিপীড়ন বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের সীমান্তে নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়েছে। ইতিপূর্বে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত চিহ্নিতকরণ এবং ভূমি ও সমুদ্রের অধিকার নিয়ে বেশ কয়েকবার সংঘাত হয়েছে। ২০১৮ সালের ১৩ জুলাই মিয়ানমারের একটি সামরিক হেলিকপ্টার বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার আলীকদম উপজেলায় আন্তর্জাতিক আকাশ সীমা লঙঘন করে ঢুকে পড়ে যেটা বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ (Dhaka Tribune, 2018)। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত দুর্গম হওয়ার কারনে সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হয় না। ফলে রাখাইনে সরকার বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কারনে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হলে তার প্রভাব অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ওপর চলে আসে (Muniruzzaman, 2017)। রাখাইন স্টেটে সৃষ্ট উত্তেজনার কারনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী রোহিঙ্গাদেরকে উগ্র সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে পারে যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করতে পারে। রাখাইনে রোহিঙ্গাদের

ওপর দমন-পীড়ন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা নিজেদের ব্যক্তিগত অভাবের স্বার্থে মাদক চোরাচালান ও অস্ত্র চোরাচালানসহ বিভিন্ন অবৈধ কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। রাষ্ট্রীয় মদদে স্থানীয় বৌদ্ধ উগ্রপন্থীগোষ্ঠী মুসলিম সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে যা বাংলাদেশের জনগণেরে মাঝে ক্ষোভ তৈরি করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অস্থিতিশীল হচ্ছে এবং এদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু বৌদ্ধরা মুসলমানদের থেকে সব সময় হুমকিতে থাকে। RSO বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গীগোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র পরিচালনা ও বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছে (Yesmin, 2016:83)। উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলো ইসলামী জঙ্গী সদস্য নিয়োগের উর্বর ক্ষেত্রে পরিনত হতে পারে। নিজ দেশের প্রতি ভালবাসা থেকে রোহিঙ্গারা স্বশস্ত্র পদ্ধতিতে তাদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা থেকে উগ্রগোষ্ঠীতে পরিনত হতে পারে (Rahman,2010:235; idris, 2017:7)। রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে কিছু অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার বিষয় , যেমন: পাসপোর্ট জালিয়াতি, জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি এবং পরিচয় গোপন করে বিবাহ করা ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। পাসপোর্ট অফিসের কিছু কর্মচারী ও স্থানীয় দালালের মাধ্যমে বহু সংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে এবং মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছে। উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোতে বেশ কিছু সংখ্যক মিয়ানমারের গোয়েন্দা সদস্য অবস্থান করছে, যারা এখানকার সার্বিক পরিস্থিতি মিয়ানমারের নিকট তুলে ধরছে, এটি একটি স্বাধীন দেশের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ (Zaman,2019) । অভ্যন্তরীন আধিপত্য বিস্তার এবং সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করে সংঘটিত হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে স্থানীয় পুলিশ বাহিনী ৫৫জন রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার করে (The Daily Star,2018)। রোহিঙ্গারা পুলিশের সাথে নানা রকম দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৯৮ সালে ৬৪জন রোহিঙ্গা পুলিশের সাথে সংঘর্ষের জন্য জেলে গিয়েছিল (Ullah, 2011:154)। ২০১৯ সালের ১৭ মার্চ উদ্বাস্তু ক্যাম্পে সংঘর্ষের ঘটনায় ১৩জন রোহিঙ্গাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে (The Daily Star, 2019)। রোহিঙ্গা সংকটের কারনে যে বহুমুখী নিরাপত্তা সংকট

তৈরি হয়েছে তাতে সর্বপ্রথম স্থানিক জনগোষ্ঠী, এরপর জাতীয় ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা হুমকিতে রয়েছে।

৫.৪.৮ মাদক, অস্ত্র ও মানব পাচার

বাংলাদেশ সরকারের এক হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গা চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে যারা নিবন্ধিত নয়। তাদের অধিকাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে এবং ভালো উপার্জনের আশায় অনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে (Datta, 2015:136)। বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী রোহিঙ্গাদের এসব অবৈধ কর্মকান্ডের বিষয়ে সতর্ক রয়েছে। তারা 'ইয়াবা' নামক ভয়ঙ্কর এক ধরনের মাদক পাচার করে থাকে, যা মিয়ানমারে উৎপাদন হয় এবং কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে (Shymol, 2017)। ভৌগোলিকভাবে "গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল" ভূক্ত তিনটি দেশ মিয়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ আফিম উৎপাদনকারী "গোল্ডেন ক্রিসেন্ট" ভূক্ত তিনটি দেশ ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তও এদের সাথে ভূ-বেষ্টিত, যেখানে বাংলাদেশকে মাদক চোরাচালান ও হেরোইন পাচারের উর্বর ভূমি হিসাবে ব্যবহার করা সুবিধাজনক (Yesmin, 2017:405)। এভাবে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা অস্ত্র চোরাচালান, মাদক পাচার এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ততার কারনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করছে। যেসব রোহিঙ্গারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে মরিয়া তারা নিরাপদ পাড়ি জমানোর লক্ষ্যে ও কিছু টাকার লোভে মাদক পাচারে রাজি থাকে। উদ্বাস্তুরা স্থানীয় জেলেদের সাথে সীমান্তে গিয়ে তাদের অন্যান্য জিনিজপত্রের সাথে মাদক নিয়ে আসছে। একসাথে হাজার হাজার উদ্বাস্তু সীমান্ত পাড়ি দিতে জড়ো হয়েছে, এদের মধ্য থেকে চোরাচালানের জিনিসপত্র বের করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। চোরাকারবারিরা রোহিঙ্গাদেরকে সহজেই রাজি করিয়ে বার বার একই কাজ করে যাচ্ছে (Bremner, 2018)। উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলো চোরাচালানের টুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। ইয়াবার ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে চোরাচালান বৃদ্ধি পায়। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর ঢল বাংলাদেশে আসা শুরু হলে দেশের প্রতিটি প্রান্তে ইয়াবার মতো একটি ভয়ঙ্কর মাদক পৌছে যায় এবং সহজলভ্য পন্য হয়ে ওঠে (Bremner, 2018)। মাদক চোরাচালান রোধ ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ

সেনাবাহিনী এবং পুলিশ সদা সতর্ক রয়েছে। অরক্ষিত সীমান্ত ও বাহিনী সদস্যদের কারো কারো ঘুষ-দুর্নীতির কারনে সরকারের উদ্যোগ পরিপূর্ণভাবে সফল হতে পারে না (BIPSS, 2017:5)। রোহিঙ্গা সংকটের অন্যতম হুমকি হলো মানব পাচার। রোহিঙ্গা সংকটের মাধ্যমে মানব পাচার চক্র তৈরি হয়েছে। উদ্বাস্তুদের অন্তঃপ্রবাহ মানব পাচারকারীদের জন্য রাষ্ট্রহীন ও অরক্ষিত রোহিঙ্গাদের শোষণের নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। মূলত পাচারকারীরা নিপীড়নের শিকার ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে অন্যরকম খেলায় মেতেছে। বাংলাদেশের শ্রম বাজারে রোহিঙ্গাদের কোন বৈধতা নেই,ফলে তারা কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে বিশেষ করে নদীপথে এবং আকাশপথে মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবের অনিশ্চিত গন্তব্যে পাড়ি দেয় যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের বিষয়। রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত বাড়িতে, রেস্ট হাউজ, গেস্ট হাউজ ও হোটেলে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে এবং কিছু ক্ষেত্রে যৌন কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে (The Daily Star, 2018)। রোহিঙ্গা বালিকাদের কাজের লোভ দেখিয়ে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় নিয়ে এসে কৌশলে নেপাল ও কলকাতায় যৌনকর্মী হিসাবে পাচার করা হচ্ছে (The Daily Star, 2018)। বঙ্গোপসাগর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানব পাচারের সহজলভ্য রুটটি ২০১০ সালের দিকে চালু হয় এবং বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদেরকে এই পথে পাচার করা হচ্ছে (Aziz, 2019)।

৫.৫ উপসংহার

বাংলাদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া নিয়ে সরকারের কর্তৃপক্ষ, সহায়তাকারী সংগঠনসমূহ, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ, পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহ, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিভাগ সদা জাগ্রত এবং তারা স্থানিক জনগোষ্ঠী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন। রোহিঙ্গা সংকট একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। স্থানিক জনগোষ্ঠীর মাঝে রোহিঙ্গা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকট বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। একটি টেকসই ও স্থায়ী শান্তিপূর্ণ সমাধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর থেকে এই হুমকি হ্রাস করা সম্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় কার্যকরী পদক্ষেপ

পাল্টা ব্যবস্থা বা কার্যকরী পদক্ষেপ বলতে বোঝায় কোনো সংকট মোকাবিলায় কৌশলগতভাবে সমাধানের পথ উন্মোচন করা (Nissel, 2006)। অধিকাংশ সময় প্রতিব্যবস্থা প্রয়োগ হয় মূলত বিরোধী পক্ষকে দমন অথবা চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে এবং নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, পুলিশিং অথবা আইনগত অভিযানের ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বেআইনি কাজের জন্য এক পক্ষ অন্য পক্ষকে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ঘায়েল করে। আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে প্রতিব্যবস্থা কার্যে পরিনত করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সেখানে সরকারগুলো রাজনৈতিক দৃষ্টিতে কূটনৈতিকভাবে জাতিগুলোর মধ্যে সংকট নিরসনের চেষ্টা করে। রোহিঙ্গা সংকট মিয়ানমারের অভ্যন্তরীন সংকট কিন্তু এর প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের ওপর। মিয়ানমারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব রয়েছে, তাই সংকট নিরসনে প্রতিব্যবস্থা হিসাবে শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর জোর দেওয়াই কার্যকরী পন্থা হতে পারে। ১৬ মে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রকাশিত ICG এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন বিষয়ে ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য মিয়ানমার ও বাংলাদেশ একমত প্রকাশ করে (ICG, 2018:1)। কিন্তু নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা ও নাগরিকত্বের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা না থাকায় একজন রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুকেও মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি এবং ধাপে ধাপে আরো কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসছে। এই অবস্থা প্রমান করে যে, রাখাইনে নিরাপত্তা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটেনি এবং সেখানে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধান ব্যতীত প্রত্যাবাসনের কোনো উদ্যোগ সফল হবে না। ICG শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর কোনো সম্ভাবনা দেখছে না। এর ফলে রাষ্ট্রদ্বয়ের মাঝে সীমান্তবর্তি অঞ্চলে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে। অনুরুপভাবে UNHCR এর ১৯৯২ সালের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের নীতি অনুসারে কোনো রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরে বসবাসরত উদ্বাস্তুদেরকে অন্য দেশে ফেরত পাঠাতে পারবে না, যদি সেখানে নিপীড়ন-নির্যাতনের ভয় থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট

দুটি রাষ্ট্র বা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের সংকট নিরসনের জন্য কোনো কার্যকর সমাধান দিতে পারছে না।

৬.১ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকট সমাধানের সম্ভাবনা

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা যদি পরবর্তি এক –দুই বছরের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে মিয়ানমারে ফেরত যেতে না পারে অথবা একেবারেই ফেরত যেতে না পারে, তাহলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর স্থায়ীভাবে বিরূপ প্রভাব পড়বে (Cookson, 2017a)। কক্সবাজারের স্থানিক জনগোষ্ঠী ও রোহিঙ্গাদের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে যেতে পারে এবং রোহিঙ্গা উপস্থিতিতে তাদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তুষ্টি দেখা দিতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, অধিকাংশ রোহিঙ্গা তাদের নিজ দেশে ফেরত যেতে চায়, যদি সেখানে নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকার এবং মর্যাদার নিশ্চয়তা থাকে (ICG, 2018:4)। উদ্বাস্তুদের কিছু অংশ স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে থেকে যেতে চায়, যদিও সরকার তাদের ব্যাপারে অনাগ্রহী। বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের মধ্যে আমলাতান্ত্রিকভাবে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ সালে শুরু করার প্রক্রিয়া হাতে নেয়া হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরবর্তি দুই বছরের মধ্যে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হয় (ICG, 2018:2)। কক্সবাজারে পরিস্থিতির অবনতি হলে বা সহায়ক না হলে রোহিঙ্গাদেরকে প্রয়োজনে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার জোড়ালো উদ্যোগ নিবে (CGA, 2018:11)। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকার ও স্থানিক জনগোষ্ঠী সহানুভূতি দেখানোর পাশাপাশি সরকার এও ঘোষণা করে যে, মানবিক প্রয়োজনে তাদেরকে আশ্রয় দেয়া হলো, কিন্তু এখানে দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থান করতে দেওয়া হবে না।

বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবে প্রত্যাশা করে যে, মিয়ানমার রোহিঙ্গাদেরকে নিজ দেশে ফেরত নিবে। CGA এর ২০১৮ সালের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিস্থিতির উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি (CGA, 2018)। কিন্তু রাখাইনে ক্ষণস্থায়ী নিরাপত্তার মধ্যে প্রত্যাবাসন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলেই বিবেচিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ৮ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের একটি তালিকা মিয়ানমার সরকারের নিকট দিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত

মিয়ানমার সে সম্পর্কে কোনো সাড়া দেয়নি (Hunt, 2018)। ২০১৮ সালের জুন মাসে ICG প্রকাশিত এক রিপোর্টের তথ্য মতে, আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো রোহিঙ্গাই মিয়ানমারে ফেরত যায়নি। মিয়ানমার সরকার বার বার ঘোষণা করেছে যে, রোহিঙ্গাদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত আবাসন তৈরি করা হয়েছে, প্রত্যাবাসিত রোহিঙ্গাদের সেখানে রাখা হবে। সেখানে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক রোহিঙ্গার জন্য ক্যাম্পগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে যা অত্যন্ত সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত থাকবে। মিয়ানমার সরকার রাখাইন স্টেটে আগুন দিয়ে পোড়ানো রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলো ধ্বংস করে সেখানে নতুন রাস্তা, নিরাপত্তা চৌকি এবং বিদ্যুত লাইন নির্মান করছে (ICG, 2018)। সরকার অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীগুলোকে রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলোতে বসবাসের জন্য উৎসাহিত করছে, এতে রোহিঙ্গাদের নিজ গ্রামে ফেরত যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীন হচ্ছে। জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক সংস্থা ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া এবং রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে (Siddiqui & Tarrant, 2018)। রাখাইনের স্থানিক রাজনৈতিক কর্মী ও জনগণ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিরোধীতা করছে, এতে প্রত্যাবাসন উদ্যোগের সফলতা হুমকিতে রয়েছে (ICG, 2018:4)। তাই রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের জন্য প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে।

৬.২ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকট সমাধানে স্টেকহোল্ডারদের পদক্ষেপসমূহ

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক সংস্থারকে সাথে নিয়ে কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে অর্থ সহায়তা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে (Sen, 2017)। বাংলাদেশের ততকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী ২০১৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের প্রতিনিধির সাথে এক বৈঠকে উদ্ভূত পরিস্থিতির একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি কক্সবাজারের ওপর উদ্বাস্তু সংকটের কারনে তৈরি নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে তুলে ধরেন এবং সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে স্থানিক জনগোষ্ঠী ও উদ্বাস্তুদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সংঘাতে রূপ নিতে পারে বলে উল্লেখ করেন। তিনি মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতামূলক উদ্যোগের অংশ হিসাবে নিরাপত্তা ইস্যুতে বর্ডারে লিয়াজো অফিস চালু করার বিষয়টি তুলে ধরেন। সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও

প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন পুনরায় চালুর বিষয়ে আশাবাদী। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডারদের সাথে অথবা এককভাবে প্রতিব্যবস্থা হিসাবে সমস্যা সমাধানে অবস্থান নিয়েছে। প্রত্যাবাসন পরিকল্পনায় একই সাথে সব কিছু অন্তর্ভূক্ত থাকলে সেটিকে উত্তম প্রতিব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ সরকার কক্সবাজার এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে অবকাঠামোগত সুবিধা বাড়াতে চায়। কিন্তু কক্সবাজারের উন্নয়নে এই পরিকল্পনা সরকার এখনো ভালভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে চায় যাতে এর প্রভাব স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর কম পড়ে। ইতোমধ্যে ৩০ হাজার রোহিঙ্গাকে অস্থায়ী আশ্রয়ে ভাষানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার ১ লাখ রোহিঙ্গাকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধাসহ ভাষানচরে দ্বীপে অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে (দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ মে ২০২২:২)। কিন্তু বিষয়টি এজন্য সমালোচিত হচ্ছে যে, উদ্বাস্তুদের জন্য অস্থায়ী আবাস হিসাবে গৃহীত পদক্ষেপে অনিশ্চয়তা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার তার সম্ভাব্য সকল পন্থায় বিশ্বের জাতিসমূহের মাধ্যমে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছে যাতে সেখানে বসবাসরত সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে মানবাধিকার সমুন্নত থাকে এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ন বন্ধ হয় (Imran & Miah, 2014)। রোহিঙ্গা ইস্যুতে দক্ষিন এশিয়ার আঞ্চলিক জোট South Asian Association for Regional Co-operation(SAARC) এবং দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক জোট Association of South-East Asian Nations(ASEAN) এর নিষ্ক্রিয়তা সমালোচিত হচ্ছে, যদিও মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া মানবিক বিচারে মিয়ানমারের ওপর রোহিঙ্গাদের পক্ষ নিয়ে চাপ প্রয়োগ করছে। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আসিয়ানের ৩২তম সম্মেলনে মিয়ানমারের প্রতিনিধির সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ইন্দেনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট রোহিঙ্গা মুসলিম সংখ্যালঘুর মানবাধিকার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন (Sapiie, 2018) । এই আঞ্চলিক সংগঠনগুলো কার্যকর পদক্ষেপ নিলে সেটা মিয়ানমারে মানবাধিকার লংঘনের উত্তম একটি প্রতিব্যবস্থা হিসাবে কাজ করবে।

মিয়ানমারের ওপর প্রভাব রয়েছে এমন রাষ্ট্র, যেমন:চীন,ভারত এর সাথে আলাপ-আলোচনা করে বাংলাদেশ সংকট সমাধানে সহযোগিতা চাইতে পারে (Ullah, 2017)। বাংলাদেশ ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (OIC) এর সদস্য হিসাবে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ ও বেসরককারি সাহায্য সংস্থাগুলোর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে এবং মানবাধিকার লংঘন, নিপীড়ন ও বর্বর নির্যাতন রোধে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গঠন করতে পারে। রাখাইন স্টেটে সহিংসতা বন্ধ এবং জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে অনুমতি প্রদানের জন্য মিয়ানমারের ওপর সর্বদা চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে (ICG, 2018:15)। রাখাইনে চলমান নিপীড়নের প্রেক্ষিতে গঠিত কফি আনান কমিশন সেখানকার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে (Advisory Commission on Rakhine State, 2017:27)। আরাকানের দীর্ঘদিনের বৌদ্ধ-মুসলিম দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি কফি আনান কমিশনের সুপারিশ কামনা করে। আনান কমিশনের রিপোর্ট মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের পুনরায় সম্মান ,নিরাপত্তা, নাগরিকত্ব প্রদান এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে (Kofi Anan Foundation, 2017:2)। কফি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকটের গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে। ২০১৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের দেয়া ভাষণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের রূপরেখা পেশ করেন। সংকট নিরসনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ দফা ছিলো: এক.অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও ‘জাতিগত নিধন’ বন্ধ করা; দুই. অনতিবিলম্বে মিয়ানমারে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করা; তিন. জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান এবং এ লক্ষ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা; চার. রাখাইন রাজ্য থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত সকল রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা; এবং পাঁচ. কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার নিঃশর্ত, পূর্ণ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা (উদ্দিন, ২০১৭:১৪১)।

কিন্তু মিয়ানমারের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ আনান কমিশনের দিকে নজর দেয়নি। তারা একথা বলে যাচ্ছে যে, এটি বিদেশীদের দ্বারা গৃহীত একটি পদক্ষেপ এবং বিষয়টি বর্তমানে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের এখতিয়ারে চলে গেছে (Deppermann, 2013:291)। জাতিসংঘ প্রতিব্যবস্থা হিসাবে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২ এবং ১৫ অনুযায়ী 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যা' এবং মিয়ানমাররে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিলে সমস্যার কূটনৈতিক সমাধানে সহায়ক হতে পারে (ICG,2018;Ventura, 2014:97-99)। বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক সংকট, রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে হেগে অবস্থিত জাতিসেংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের মাধ্যমে শুধুমাত্র মিয়ানমারের মতো ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাসী ও সহিংস কর্মকান্ড বন্ধ করতে আশা জাগাতে পারে। কিন্তু বাস্তবে ICJ রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে জাতিগত নিধন বন্ধ করতে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ বা প্রধান অপরাধীদের বিচার করার ক্ষেত্রে ক্ষমতাহীন।

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশমালা

নির্যাতন, সহিংসতা, নিপীড়ন থেকে বাঁচতে বিশ্বব্যাপী উদ্বাস্তুর ঢল দেখে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনসূহ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ এবং মানবিক সহায়তাকারী সংস্থাগুলোর অক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। UNHCR এর এক প্রতিবেদন মতে, ২০১৭ সালে জোরপূর্বক দেশ থেকে বিতাড়িত মানুষের সংখ্যা নজিরবিহীন অবস্থায় পৌছেছে এবং বিশ্বের সকল অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরী করেছে। বিশ্বের নানাবিধ সংকটের মাঝে রোহিঙ্গা সংকট একটি অংশ হলেও বাংলাদেশের ওপর এটির যে প্রভাব পড়েছে তা বিশ্বের অন্যতম একটি মারাত্মক মানবিক সংকট সৃষ্টিকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে উদ্বাস্তু সংকটের গভীরে যাওয়া যায় এবং তা প্রতিরোধ করার উপায় বের করা যায় বা উদ্বাস্তু গ্রহণকারী জনগণের ওপর সৃষ্ট প্রভাব কমিয়ে আনার উপায় জানা যায়।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু গ্রহণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং নিরাপত্তাজনিত যে প্রভাব তৈরি হয়েছে তা তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার, স্থানিক জনগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব দশকের পর দশক ধরে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে সহানুভূতি দেখিয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক আইন মেনে উদ্বাস্তুদের প্রবেশ ও অস্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। স্থানিক জনগোষ্ঠী ও সার্বিকভাবে বাংলাদেশের ওপর রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু উপস্থিতির নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুই ধরনের দৃশ্যমান প্রভাব রয়েছে। একদিকে, গবেষণায় প্রাপ্ত ইতিবাচক তথ্য হলো অর্থনৈতিক প্রভাব, যেখানে স্থানিক জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করেছে। বিশেষ করে দাতাগোষ্ঠী ও এনজিওগুলোতে চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে এবং উন্নয়ন সহায়তার নিমিত্তে তহবিল গঠিত হয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক সুযোগ তৈরি হয়েছে, যেখানে স্থানিক জনগোষ্ঠী এবং রোহিঙ্গাদের জন্য অধিক সহজলভ্য হয়েছে।

অন্যদিকে, এই গবেষণার মাধ্যমে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের ভয়াবহ নেতিবাচক দিক উঠে এসেছে। স্থানিক শ্রমিকের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, দৈনিন্দিন অপরিহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, দৈনন্দিন আয় হ্রাস, কৃষিজমি ধ্বংস ও হ্রাস, যাতায়াত ভাড়া বৃদ্ধি, পরিবেশ বিপর্যয়, রোগের বিস্তার বৃদ্ধি (বিশেষ করে সংক্রামক) এবং উদ্বাস্তুদের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়াসহ বেশ কিছু নেতিবাচক দিক উঠে এসেছে। পর্যটনখাতের মন্দাভাবের কারনে স্থানিক জনগোষ্ঠীর অনেকে কাজের সুযোগ হারিয়ে বেকার হয়েছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জনাকীর্ণ উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোতে সীমিত আকারে স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা রয়েছে, বিশেষ করে আগস্ট ২০১৭ সালে উদ্বাস্তু সংকটের পরে অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে চলে গেছে যা স্থানিক জনগোষ্ঠীকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। রোহিঙ্গাদের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার কারনে স্থানিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়া নিয়ে চরম আতঙ্ক বিরাজমান রয়েছে। উদ্বাস্তুরা বিশাল পরিমান ময়লার বাগাড় তৈরি করছে এবং নিম্ন মানের টয়লেট ব্যবহারের কারনে পরিবেশ ও স্থানিক জনগণের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তাছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু উপস্থিতির কারনে কক্সবাজার অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস ও হ্রাস পেয়েছে, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে, বন্যপ্রাণির অভয়াশ্রম হ্রাস পেয়েছে, প্রাণি সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, পাহাড় ধ্বংস হয়েছে, যার ফলে স্থানিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের স্থায়িত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। ২০১৭ সালের আগস্টের পর থেকে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধির কারনে ক্যাম্প নির্মান ও জ্বালানির চাহিদার পূরনে পাহাড় ও বনভূমি উজাড় করা হয়েছে যা বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। স্থানিক জনগোষ্ঠীর নিকট নিরাপত্তার সংকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়িয়েছে, বিশেষ করে যারা রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের কঠোর ও নির্দয় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড নিয়ে ভাবেন। রোহিঙ্গাদের অনেকে মাদক চোরাচালান, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায় এবং মানব পাচার চক্রের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে। কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত, যার কারনে স্থানিক জনগোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ এবং স্বাধীন জীবনযাপনের ওপর হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আন্তঃকোন্দলের কারনে ক্যাম্পে তাদের দুইজন নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। উদ্বাস্তু ক্যাম্প এলাকার নিকটবর্তি স্থানিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, পরিবেশ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। উদ্বাস্তুদের অন্তঃপ্রবাহের কারনে স্থানিক জনগোষ্ঠী সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও শুধুমাত্র রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরাই

মানবিক সহায়তাকারীদের সহায়তা পাচ্ছে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ হারানো স্থানিক জনগোষ্ঠীর দুর্দশা আরো বেড়েছে এবং জীবনযাপনে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ জনমনে অসন্তোষ ও নিরাশা বেড়েছে।

আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে বেশ কিছু ফলাফল বের হয়েছে, যেখানে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের কারনে স্থানিক জনগোষ্ঠীর ওপর যে প্রভাব পড়েছে তা নিরসনে সরকার, এনজিও ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। ভবিষ্যতে আরো বড় ধরনের গবেষণার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সমাধানের পন্থা আবিষ্কার করতে হবে যাতে স্থানিক জনগোষ্ঠী ও উদ্বাস্তু উভয়ই লাভবান হয়।

গবেষণাকর্মটির আরো লক্ষ্য হলো বাংলাদেশ ও স্থানিক জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক সম্ভাব্য কার্যকরী সমাধান, কৌশল ও নীতি চিহ্নিত করা; বাংলাদেশ ও মিয়ানমার এবং আন্তর্জাতিক সহায়তাকারী সংস্থা ও এনজিওগুলোর সাথে আলাপ আলোচনার পাশাপাশি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিতকরণে সর্বোত্তম সমাধান খুঁজে বের করা। ২০২২ খ্রি. এই গবেষণা প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত সংকট চলমান রয়েছে এবং উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসনে কোনো কার্যকরী সমাধান দেখা যায়নি। তবে মিয়ানমারের সামরিক সরকারের সাথে UNHCR এর উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসন বিষয়ে ইতোমধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ বৃদ্ধি করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। UNHCR বাংলাদেশের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী স্বপ্রনোদিত উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যারা প্রত্যাবাসিত হবে তাদেরকে ট্রানজিট ক্যাম্পে দেখভালের দায়িত্ব পালন করবে এবং লজিস্টিক ও যাতায়াতের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । যাই হোক, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসনের পূর্বে জাতিগত ও ধর্মীয় আন্তঃ দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে, রোহিঙ্গাদেরকে পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা দিতে হবে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য হয়। গবেষণাকর্মটিতে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকটের কারন অনুসন্ধান করা হয়েছে, যেখানে সংকটের পিছনে ধর্ম, জাতিগত দ্বন্দ্ব এবং ঐতিহাসিক, ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত রয়েছে,

এমন তথ্য পাওয়া গেছে। ফলে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংকটের যে জটিলতার কথা উঠে এসেছে, বাস্তব অবস্থা তার চেয়ে আরো গভীর।

উপসংহারে এভাবে বলা যায় যে, উদ্বাস্তু সংকট সমাধানের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মিয়ানমারের অবস্থান বিতর্কিত ও সন্দেহপূর্ণ। বিশেষ করে সংক্ষিপ্ত মেয়াদে, কিন্তু যদি প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহ, আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ এবং জাতিসংঘ কূটনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে, তাহলে তারা সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হতে বাধ্য হতে পারে। রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি বন্ধ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নাগরিকত্বের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে মিয়ানমারকে রাজি করাতে স্টেকহোল্ডাদের ব্যর্থতা অবশ্যই উদ্বিগ্নতার বিষয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সংকট সমাধানে আরো সময় লেগে যেতে পারে এবং এই কালক্ষেপনের কারনে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংকটের বোঝা কক্সবাজারের স্থানিক জনগোষ্ঠী ও বাংলাদেশকে দীর্ঘকাল বহন করতে হবে। পুনারায় যাতে সংকট বৃদ্ধি পেয়ে শোচনীয় না হতে পারে সেটা সামাল দেওয়াই হবে স্বল্প মেয়াদে সবচেয়ে বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

গ্রন্থপঞ্জি

Abey, AH 2013, 'Economic Effects of Urban Refugees on Host Community: Case of Somali Refugees in Eastleigh: 1991-2012', MA Thesis, University of Nairobi, Kenya.

Abrar, CR 1996, *Repatriation of Rohingya refugees,* Refugee and Migratory Movements Research Unit, Dhaka.

Abrar, CR 2015, 'Government Strategy paper on Rohingya', *The Daily Star,* 8 March, viewed 1 April 2021, <https://www.thedailystar.net/government-strategy-paper-on-rohingyas-29526>.

Ahmed, I 2010, *The plight of the stateless Rohingyas,* The Universal Press Limited, Dhaka.

Ahmed, K 2018, *Bangladesh forests stripped bare as Rohingya refugees battle to survive*, MONGABAY, Menlo Park, USA, viewed 9 May 2020, <http://news.mongabay.com/2018/01/bangladeshi-forests-stripped-bare-as-rohingya-refugees-battle-to-survive/>.

Akhter S & Kusakabe K 2014, 'Gender-based violence among documented Rohingya refugees in Bangladesh', *Indian journal of Gender Studies*, vol.21, no 2, 225-246.

Alam, F 2012, 'Rohingya Refugee in Bangladesh:Humanitarian Assistance, Internal Disturbances and The Role of External Factors', in N Uddin (ed.), *To Host or To Hurt: Counter-Narratives on Rohingya Issue in Bangladesh*, Institute of Culture and Development Research (ICDR), Dhaka.

Alam, M 2018a, 'How the Rohingya crisis is affecting Bangladesh-and why it matters', *The Washington Post*, 12 February, viewed 1 March 2021, <http://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/02/12/how-the-rohingya-crisis-is-affecting-bangladesh-and-why-it-matters/?utm_term=.2f51d2eb52d5>.

Alam, M 2018b, 'Violence at home, insecurity here, uncertainty ahead', *The Daily Star,* 27 January, viewed 1 March 2021, <http://www.thedailystar.net/star-weekend/violence-home-insecurity-here-uncertainty-ahead-1514953>.

Alam, S, Misbahuzzaman, K, Rahman, MA & Kabir, MH 2014, 'Threats to the Teknaf wildlife Sanctuary of Bangladesh', *Journal of Environmental Science & Natural Resources*, vol. 7, no. 1, pp. 233-239.

Alamgir, NU & Rubel, W 2018, 'Rohingyas get involved in crimes, internal conflicts', *The Daily Sun*, 29 January, viewed 14 May 2020, <http://www.daily-sun.com/printversion/details/285276/Rohingyas-get-involved-in-crimes-internal-conflicts>.

Albert, E 2017, *The Rohingya Migrant Crisis*, Council on Foreign Relations, New York, viewed 2 April 2021, <http://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-migrant-crisis>.

Ali, SM 2017, 'India must play important role in resolving Rohinya crisis', *The Indian Express,* 22 October, viewed 1 April 2021, <https://indianexpress.com/article/india/india-must-play-important-role-in-resolving-rohingya-crisis-syed-muazzem-ali-4900495/>.

Alix-Garcia, J & Saah, D 2009, 'The Effects of refugee Inflows on Host Communities: Evidences from Tanzania', *World Bank Economic Review*, vol. 1, pp. 148-170.

Anwar, MS 2013, 'Rakhine State Government to Make 'MaKhaPha' a New 'NaSaKa',*Rohingya Vision*, viewed 5 April 2020, <http://www.rvisiontv.com/rakhine-state-government-to-make-makhapha-a-new-nasaka/>.

Arendshort, J 2009, 'The dilemma of non-interference: Myanmar, Human rights, and ASEAN chapter', North western journal of International Human Rights, vol. 8, no. 1, pp. 2-21.

Asik, USM & Masakazu, T 2017, 'Fuelwood consumption and its impact on forest in the Teknaf peninsula on the Southern Coast of Bangladesh', *American Journal of Environmental Sciences*, vol. 13, no. 3, pp. 225-232.

Atim, G 2013, 'The Impacts of Refugees on Conflicts in Africa', IOSR Journal Of Humanities And Social Science, vol. 14, no. 2, pp. 4-9.

Aung-Thwin, M and Aung Thwin, M 2012, 'A history of Myanmar since ancient times:Traditins and Transformations', London: Reaktion Books,2012, pp. 325, Illustrations, Notes, Bibliography, Index. Published online by Cambridge University Press: 22 April 2013. <https://www.cambridge.org/core/journals /journa -of- southeast- asian- studies/article/ abs/ myanmar -a-history -of- myanmar -since -ancient -times -traditions -and -transformations -by-michaelaung-thwin-and-matriiaung-thwin-london-reaktion-books-2012-pp-325-illustrations-notes-bibliography-index/4EFF73D4FB74C390656C5DD83EE91EC6>.

Ayako, S 2014, 'The formation of the concept of Myanmar Muslims as indigenous citizens: Their history and current situation', *The Journal of Sophia Asian Studies,* no. 32, pp. 26-40.

Azad, A & Jasmin, F 2013, 'Durable solutions to the protracted refugee situation: The case of Rohingyas in Bangladesh', *Journal of Indian Research,* vol. 1 no. 4, pp. 25-35.

Aziz, Abdul 2018, 'Locals unhappy as Rohingya population grows in Cox's Bazar', *Dhaka Tribune,* 27 August.

Baldin, C & Marshall, ARC 2018,' Rohingya refugees test Bangladeshi welcome as prices rise and repatriation stalls', *The Reuters,* 28 February, viewed 10 May 2020, <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-bangladesh-tensions/rohingya-refugees-test-bangladesh--welcome-as-prices-rise-and-repaptriation-stalls-idUSKCN1GC08Y>.
Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) 2018, *labour Force Survey Bangladesh 2016-2017.* Dhaka

Benjamin, J & Fancy, K 1998, 'The gender dimensions of internal displacement: Concept paper and annotated bibliography', In UNICEF/IDP Gender Issues Paper, Office of Emergency Programmes, UNICEF, viewed 1 April 2021, <http://www.forcedmigration.org/sphere/pdf/watsan/WCRW/unicef_idpgender_1998.pdf>.

Bennett, j 2017, 'Rohingya refugees a terror risk, Bangladesh minister says amid Myanmar exodus', ABC News, 21 September, viewed 14 May 2020, <http://www.abc.net.au/news/2017-09-21/rohingya-refugees-a terror-threat-bangladesh-minister-tells-abc/8966574>.

Berman, J 2013, 'Utility of a conceptual framework within doctoral study: A researcher's reflections', Issues in Educational Research, vol. 23, no. 1 pp. 1-18.

Betts, A 2009, 'Development Assistance and Refugees, towards a North-South Grand bargain?', Forced Migration Policy Briefing 2, Refugee Studies Centre, University of Oxford, United Kingdom.

Bremner, Matthew 2018, 'The Unwilling Smugglers', The Roads and Kingdoms, *Dhaka Tribune* 13 July, viewed 5 September 2020.

Brooten, L 2015, 'Blind Spots in Human Rights Coverage: Framing violence Against the Rohingya in Myanmar/ Burma', Popular communication, vol. 13, no. 2, pp. 132-144.

Brooten, L, Ashraf, SI & Akinro, NA 2015, 'Traumatized victims and multilated bodies: human rights and the 'politics of immediation' in the Rohingya crisis of Burma/Myanmar', *The International Communication Gazette,* vol. 77 no. 8, pp. 717-734.

Chambers, P 2015, *The Rohingyas' Trail of Tears: Continuing Persecution of an Ethnic Minority in Myanmar*, south Asia Democratic Forum (SADF), Brussels, Belgium, viewed 7April 2021, <http://sadf.eu/new/wp-content/uploads/2015/10/FOCUS.N.9-Chambers.pdf>.

Constantine, G 2012, 'Bangladesh: The Plight of the Rohingya', Pulitzer Centre on Crisis Reporting, Washington DC, USA, viewed 6 April 2020, <http://pulitzercentre.org/reporting/burma-bangladesh-muslim-minority-rakhine-rohingyacommunity>.

Cookson, F 2017a, 'Impact of the Rohingya Crisis on Bangladesh (Part-1)', *The Independent*, 9 October, viewed 10 April 2019, <http://www.theindependentbd.com/post/117945>.

Cookson, F 2017b, 'Impact of the Rohingya Crisis on Bangladesh (Part-2)', *The Independent*, 10 October, viewed 11 April 2020, <http://www.theindependentbd.com/post/118117>.

Das, KN 2017, 'Exclusive: Bangladesh protests over Myanmar's suspected landmine use near border', *The Reuters*, 6 September, viewed 30 May 2019, https://www.reuters,com/article/us-myanmar-rohingya-bangladesh-landmines/exclusive-myanmar-laying-landmines-near-bangladeshborder-government-sources-in-dhaka-idUSKCN1BH04F>.

Das, M 2018, 'Worried about political implicationsof Rohingya crisis: Bangladesh minister', *The Economic Times*, 23 February, viewed 1 April 2020, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/worried-about-political-implications-of-rohingya-crisis-bangladesh-minister/articleshow/63037205.cms>.

Datta, SK 2015, 'Rohingya's Problem in Bangladesh', *Himalayan and Central Asian Studies*, vol. 19, no. 1-2, pp. 134-150.

DeHart, J 2013, 'Ashin Wirathu: The Monk Behind Burma's Buddhist Terror', *The Diplomat*, 25 June, viewed 4 march 2021, <https://thediplomat.com/2013/06/ashin-wirathu-the-monk-behind-burmas-buddhist-terror/>.

Deikun, G & Zetter R 2010, Meeting Humanitarian Challenges in Urban Areas, Forced Migration Review's website, issue no. 34, February, University of Oxford, United Kingdom, viewed 03 May 2020, <http://www.fmreview.org/urban-displacement/FMR34.pdf>.

Deppermann, LJF 2013, 'Increasing the ICJ's Influence as a Court of Human Rights: The Muslim Rohingya as a Case Study', Chicago Journal of International Law, vol. 14, no. 1, pp. 292-315.

Devi, KS 2014, 'Myanmar under the Military Rule 1962-1988', *International Research Journal of social Sciences*, vol. 3, no. 10, pp. 46-50.

Edwards, A 2016a, 'Global forced displacement hits record high', United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends report, viewed 9 June 2020, <http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html>.

Fair, C & Oldmixon, S 2015, 'Think Again: Islamism and Militancy in Bangladesh', *The national Inteest*, 13 August, viewed 3 March 2021, <http://nationalinterest.org/feature/think-again-islamism-militancy-bangladesh-13567>.

Farzana, KF 2011, 'Music and artistic artefacts: symbols of Rohingya identity and everyday resistance in borderlands', *ASEAN-Australian Journal of South –East Asian Studies*, vol. 4, no. 2, pp. 215-236.

Fossvik, IS 2018, *Rohingya refugees bracing for another disaster*, Norwegian Refugee Council (NRC), viewed 15 May 2020, <https://www.nrc.no/expert-deployment/2016/2018/rohingya-refugees-bracing-for-another-disaster/>.

Freeman, J 2017, 'Why Myanmar's Government won't negotiate with Rohingya Insurgents', *The Voice of America*, 25 September, viewed 30 April 2019, <https://www.voanews.com/a/myanmar-government-wont-negociate-with-rohingya-insurgents/4043062.html>.

Galache CS 2017, ' Rohingya villagers bear witness to a Brutal Crackdown in Myanmar', *Time*, 6 April, viewed 5 May 2020, <http://time.com/4716189/myanmar-maungdaw-rohingya-burma-eyewitness/>.

George, M 2009, *Sri Langka Tamil Diaspora: Contextualizing Pre-Migration and Post Migration Traumatic Events and Psychological Distress*, University of Toronto, Canada.

Gibbens, S 2017, 'Myanmar's Rohingya are in crisis-what you need to know', *The national Geographic*, 29 September, viewed 28 april 2021, <https://news.nationalgeographic.com/2017/09/rohingya-refugee-crisis-myanmar-burma-spd>.

Gomez, PG & Christensen, A 2010, 'The impact of refugees on neighboring countries: A development challenge', *World Development Report 2011*, Background Note, viewed 05 May2021,
<http://documents.worldbank.org/curated/en/459601468337158089/pdf/620580WP0The0IoBOX0361475B00PUBLIC0.pdf>.

Grinvald, M 2010, *Problems of Integration of Refugees and Internally Displaced Persons in Serbia*, Palacky University, Czechia, Czech Republic.

Haque, MM 2016, 'Protracted displaced and concern for security: The case of Rohingya', Proceedings of the 4th International Conference on Magsaysay Awardees, Good Governance and Transformative Leadership in Asia, College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham University, Thailand, viewed 12 May 2021,
<http://www.copag.msu.ac.th/conference4/files/PDF/19.2.md.%20Mahbubul%20haque%20860-867.pdf>.

Hofman, L 2016, 'Meet the most persecuted people in the world', *The Correspondent,* 25 February, viewed 30 April 2020,
<https://the correspondent.com/4087/meet-the-most-persecuted-people-in-the-world/293299468-71e6cf33>.

Htusan, E & Mendoza, M 2016, 'Burmese soldiers accused of raping and killing Rohingya Muslims', *The Independent*, 31 October, viewed 2 March 2020,
<https://www.independent.co.uk/news/world/asia/burma-soldiers-rohingya-muslims-rape-murder-accusation-a7388906.html>.

Hunt, L 2018, 'The trouble with Myanmar and Rohingya repatriation', *The diplomat*, 20 April, viewed 2 March 2021,
<https://thediplomat.com/2018/04/the-trouble-with-myanmar-and-rohingya-repatriation/>.

Ibrahim, A 2016, *The Rohingyas, Inside Myanmar's hidden genocide*, Hurst & Company, London.

Idris, I 2017, 'Drivers of Extremism, Violent Extremism and Terrorism (EVET) in Bangladesh', *K4D Helpdesk Report 139*, Institute of Development Studies, Brighton, UK.

Idris, I 2017, '*Rohingya Crisis: Impact on Bangladeshi Politics'*, Brighton, UK: Institute of Development Studies.

Imran, HFA & Mian, MN 2014, 'The Rohingya refugee in Bangladesh: A vulnerable group in Law and policy', *Journal of Studies in Social Sciences*, vol. 8, no. 2, pp. 226-253.

Jame, H 2006, *Security and Sustainable Development in Myanmar*, Routledge, London and New York.

Janny, NS & Islam, M 2015, 'An analysis of refugee problems in Bangladesh', *Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, vol.3, no. 3, pp. 91-98.

Jastram, KM & Achiron, MM 2001, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), viewed 20 April 2021, <http://www.unhcr.org/3d4aba564.pdf>.

Karim, S 2017, 'I visited the Rohingya refugee camps and here is what Bangladesh is doing right', *The Conversation*, 25 January, viewed 2 April 2021, <https://theconversation.com/i-visited-the-rohingya-refugee-camps-and-here-is-what-bangladesh-is-doing-right-90513>.

Khan, Sahar 2017, 'The Danger of Linking the Rohingya Crisis to Terrorism', *The Diplomate,*13 October, viewed 15 September 2021, <https://thediplomate.com/2017/10/the-danger-of-linking-the-rohingya-crisis-t0 terrorism>

Khatun, F 2017, *Implications of the Rohingya crisis for Bangladesh*, Centre for Policy Dialogue (CPD), Dhaka, viewed 15 May 2021, <http://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2017/11/Presentation-on-Implications-of-the-Rohingya-Crisis-for-Bangladesh.pdf>.

Kinacioglu, m 2012, *The principle of Non-intervention at the United Nations: The Chapter Framework and the Lega Debate*, Center for Strategic Research, Government of Turkey, Istanbul, viewed 16 March 2020, <http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/muge-Kinacioglu.pdf>.

Kipgen, N 2013, 'Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingya Muslim's Conundrum', *Journal of Muslim Minority Affair*, vol. 33, no. 2, pp. 298-310.

Kipgen, N 2014, 'Addressing the Rohingya problem', *Journal of Asian and African Studies*, vol. 49, no. 2 pp. 234-247.

Kiragu, E, Rosi, AL & Morris, T 2011, *States of denial, A review of UNHCR's response to the protracted situation of stateless Rohingya refugee in Bangladesh*, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), viewed 4 April 2021, <http://www.unhcr.org/4ee754c19.pdf>.

Kobia, K & Cranfield, L 2009, *Literature review: Urban refugees*, Carleton University, Ontario, Canada

LeCompte, MD & Goetz, JP 1993, *Ethnography and Qualitative Design in Educational Research*, 2nd Edn., Emerald Publishing, UK.

Lederman, NG & Lederman, JS 2015, 'What is a theoretical Framework? A practical answer', *Journal of science Teacher Education*, vol. 26, no. 7, pp. 593-597.

Lee, SW 2005,When refugees stream: Environmental and political implications of population displacement, Harvard University, Cambridge.

Levy, Y & Ellis, T J 2006, 'A system approach to conduct an effective literature review in support of information system research', *Information Science Journal*, vol. 9, pp. 181-212.

Lewis, D 2018, *The view from Cox's Bazar: assessing the impact of the Rohingya crisis on Bangladesh*, The London School of Economics and Political Science, viewed 13 May 2018, <http://blogs.Ise.ac.uk/southasia/2018/04/11/the-view-from-cox's-bazar-assessing-the-impact-of-the-rohingya-crisis-on-bangladesh/>.

Lone, W & Naing, S 2017, 'At least 71 killed in Myanmar as Rohingya insurgents stage major attack', *The Reuters*, 25 August, viewed 21 May 2021, <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya/at-least-71-killed-in-myanmar-as-rohingya-insurgents-stage-major-attack-idUSKCN1B507K>.

Madanat, H 2013, *Impacts of Refugees on Societies*, Hopes for Women in Education, Ontario, Canada, viewed 17 May 2021, <http://hopesforwomen.org/impacts-of-refugees-on-societies-by-haya-madanat/>.

Mahmud, T 2017, 'Refugees outnumber Ukhiya, Teknaf locals', *The Dhaka Tribune*, 23 October, viewed 8 May 2020, <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/10/23/rohingya-influx-refugees-outnumber-ukhiya-teknaf-locals/>.

Marshall, ARC 2013, 'Special Report: Myanmar gives official blessing to anti-Muslim monks', *The Reuters*, 26 June, viewed 30 March 2021, <http://www.reuters.com/article/us-myanmar-969-specialreport/special-report-myanmar-givesofficial-blessing-to-anti-muslim-monks-idUSBRE95Q04720130627>.

Martin, MF, Margesson, R & Vaughn, B 2017, *The Rohingya crisis in Bangladesh and Burma*, Congressional Research Service, viewed 26 March 2021, <https://fas.org/sgp/crs/row/R45016.pdf>.

Masud, AA, Ahmed, MS, Sultana, R, Alam, SMI, Kabir, R, Arafat, SMY & Papadopoulos, K 2017, 'Health problems and health care seeking behavior of Rohingya refugees', *Journal of medical Research and Innovation*, vol. 2, no. 1, pp. 21-29.

Maystadt, JF & Verwimp, p 2009, 'Households in Conflict Network: Winners and Losers among a Refugee-Hosting Population', *Working Paper 60,* The Institute of Development Studies, The University of Sussex, Falmer, Brighton.

McDonald M 2018, *Responding to the world's fastest growing refugee crisis,* United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Assistance (OCHA), viewed 5 May 2021, https://reliefweb.int/report/bangladesh/responding-world-s-fastest-growing-refugee-crisis>.

Miles, T 2018, 'UN says 100,000 Rohingya in grave danger from monsoon rains', *The Reuters,* 29 January, viewed 3 June 2020, <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-campus/u-n-100000-rohingya-in-grave-danger-from-monsoon-rain-idUSKBN1FI0W7>.

Milton, AH, Rahman, M, Hussain, S, Jindal, C, Choudhury, S, Akter, S, Ferdousi, S, Mouly, TA, Hall, J & Efird, JT 2017, 'Trapped in stateless: Rohingya refugees in Bangladesh', *International Journal of Environmental Research and Public Health,* vol. 14, no. 942, pp. 2-8.

Micro, K, Geotz, J & Murage, AM 2017, *Myanmar's Religious and Ethnic Conflicts: no end in sight,* Heinrich-Boell foundation, Berlin, Germany, viewed 7 April 2021, <https://www.boell.de/en/2017/05/24/myanmars-religious-and-ethnic-conflicts-no-end-sight>.

Mohajan, Haradhan (2018): *History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims.* Published in: IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies , Vol. 2, No. 1 (25 July 2018): pp. 19-46.

Mohammad, N 2011, 'International refugee law standards: Rohingya refugee problems in Bangladesh', *ISIL Y.B. International Human & Refugee Law,* vol.11, pp. 401-418.

Mohammad SS, Wroe, E, Fuller, A & Learning, J 2017, 'The Rohingya people of Myanmar: health, human rights and identity', *The Lancet,* vol. 389, no. 10081, pp. 1841-1850.

Muniruzzaman, ANM 2017, 'Rohingya Refugee Crisis in Bangladesh: Its Multi-Dimensional Implications', *RSIS Commentary,* no. 176.

Murdoch, L 2018, 'The Rohingya crisis explained', *The Guardian*, 14 September, viewed 3 June 2020, <http://www.theguardian.com.au/story/4920571/the-rohingya-crisis-explained/>.

Murshid, N 2017, 'Why is Burma driving out the Rohingya-and not its other despised minorities?', *The Washington Post,* 9 November, viewed 1 April 2021, <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-case/wp/2017/11/09/why-is-burma-military-driving-out-the-rohingya-and-not-its-other-despised-minority-groups/?utm_term=.9389c552843b>.

Nissel, A 2006, 'The ILC Articles on State responsibility between self-help and solidarity', *International Law and Politics,* vol. 38, pp. 355-371.

Palatino, M 2013, 'The Politics of Numerology: Burma's 969 vs. 786 and Malaysia's 505', *The Diplomat,* 16 May, viewed 1 April 2021, <https://thediplomat.com/2013/05/the-politics-of-numerology-burmas-969-vs-786-and-malaysia-505/>.

Panday, VC. Ed. 2004, 'Environment, Security, and Tourism Development in South Asia: Tourism development in South Asia', *Gyan Publishing House 3,* New Delhi.

Parkins, NC 2011, Push and Pull Factors of Migration, *The University of the West Indiies,* Mona, viewed 1 June 2021, <https://sites.bemidjistate.edu/arpejournal/wo-content/uploads/sites/2/2015/11/v8n2-parkins.pdf>.

Parnini, SN, Othman M R & Ghazli, AS 2013, 'The Rohingya Refugee Crisis and Bangladesh-Myanmar Relations', *Asian and Pacific Migration Journal,* vol. 22, no. 1, pp. 133-146.

Parnini, SN 2012, 'Non-traditional security and problems of Rohingya across the Bangladesh', *British Journal of Arts and Social Sciences,* vol. 5, no. 2, pp. 283-292.

Parnini SN 2013, 'The crisis of the Rohingya as a Muslim minority in Myanmar and bilateral relations with Bangladesh', *Journal of Muslim Minority Affairs,* vol. 33, no. 2, pp. 281-297.

Radhakrishna, E, Yoder, P & Ewing, JC 2007, 'Strategies for Linking Theoretical Framework and Research Types', Proceeeding of the 2007 AAAE Research Conference, Volume 34.

Rahman, U 2010, 'The Rohingya refugee: A security dilemma for Bangladesh', *Journal of Immigrant & Refugee Studies,* vol. 8, no. 2, pp. 233-239.

Razzaq, a & Haque, M 1995, *A Tale of Refugees: Rohingya In Bangladesh,* Centre for Human Rights, Dhaka, Bangladesh.

Rubel, W 2017, 'Rohingya influx causes woes for local people', *The Daily Sun.* 14 November, viewed 10 June 2021,
<http://www.daily-sun.com/post/268538/Rohingya-influx-causes-woes-for-local-people>.

Safi, M 2018, 'Rohingya Muslims' repatriation to Myanmar postponed', *The Guardian,* 22 January, viewed 4 April 2021,
<https://www.theguardian.com/world/2018/jan/22/rohingya-muslims-repatriation-back-to-myanmar-postponed>.

Sapiie, MA 2018, 'Indonesia wants end to Rohingya crisis, Jokowi tells Myint', *The Jakarta Post,* 9 June, viewed 1 June 2021,
<http://www.thejakartapost.com/news/2018/04/28/indosia-wants-end-to-rohingya-crisis-jokowi-tells-myint.html>.

Sattar, M 2017, 'Rohingya refugees in Bangladesh to be relocated to remote island', *The New York Times,* 31 January, viewed 1 June 2020,
<https://www.nytimes.com/2017/01/31/world/asia/rohingya-refugees-bangladesh.html>.

Schlein, L 2017, 'Rohingya refugees, host communities face dire conditions', *The Voice of America,* 29 October, viewed 4 May 2021,
<https://www.voanews.com/a/rohingya-refugees-host-communities-dire-conditions/4151710.html>.

Sengupta, S 2015, 'Migrant or Refugee? There is a Difference, with Legal Implications', *The New York Times,* 27 August, ciewed 6 June 2021,
<https://www.nytimes.com/2015/08/28/world/migrants-refugees-europe-syria.html>.

Sen, G 2017, *Bangladesh and the Rohingyas: Implications of Refugee Relocation to Thengar Char Island,* IDS Comments 18 May 2021,
<https://idsa.in/idsacomments/bangladesh-the-rohingya_gsen_280217>.

Shams, S 2015, 'Myanmar's Rohingya conflict' more economic than religious', Interview with Siegfried O. Wolf, *Deutsche Welle,* viewed 7 April 2021,
<http://www.dw.com/en/myanmars-rohingya-conflict-more-economic-than-religious/a-18496206>.

Shyamol, N 2017, 'Rohingyas allegedly involved in crimes in Chittagong', *The Asian Age,* 30 June, viewed 1 June 2021,
<https://dailyasiaage.com/news/70532/rohingyas-allegedly-involved-in-crimes-in-chittagong>.

Siddiquee, MM 2012, 'Who are Rohingyas and How? Origin and Development of the Rohingyas in Arakan', in N Uddin (ed.), *To Hurt: Counter-narratives on Rohingya Refugee Issue in Bangladesh,* Institute of Culture & Development research, Dhaka.

Siddiqui, Z & Tarrant, B 2018, 'U.N. urges rethink of Rohingya repatriations to ensure safeguards', *The Reuters,* 23 January, viewed 6 June 2021, <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-repatriation/u-n-urges-rethink-of-rohingya-repatriations-to-ensure-safeguards-idUSKBN1FC0MG>.

Solomon, F 2018, 'Myanmar's crisis, Bangladesh burden: among the Rohingya refugees waiting for a Miracle- Time', *World Environment Magazine,* 23 November, viewed 3 June 2021, <http://www.worldenvironment.tv/2017/11/23/myanmars-crisis-bangladesh-burden-among-the-rohingya-refugees-waiting-for-a-miracle-time/>.

Tani, M, Rahman, MZ, Moslehuddin, AZM & Tsuruta, H 2014, 'Characteristics of Dwellers as a Major agent of development a reserved forest in Bangladesh', *International Journal of Environment,* vol. 4, no. 2, pp. 25-30.

Thuzar, M & Rieffle, L 2018, *Perspective: ASEAN's Myanmar Dilemma,* Yusof Ishak Institute (ISEAS), Singapore, viewed 1 June 2021, <https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_3@50.pdf>.

Tonkin, D 2015, 'Rohingya: Breaking the deadlock', '*The Diplomat,* 16 October, viewed 2 June 2021, <https://thediplomat.com/2015/10/rohingya-breaking-the-deadlock/>.

Uddin, N ed. 2012, 'To Host or Hurt: Counter-narrative on Rohingya Refugee Issue in Bangladesh', Dhaka: International Centre for Dispute Resolution (ICDR).

Uddin, W 2015, *Persecuted and Stateless: The Crisis of Rohingya Muslims,* Interview with Religious Freedom Project, Part 1, religious Freedom Institute (RFI), viewed 3 April 2021, <https://www.religiousfreedominstitute.org/cornerstone/2016/7/14/persecuted-and-stateless-the-crisis-of-rohingya-mmuslims>.

Ullah A 2017, *Bangladesh policy on Rohingya refugees,* The Stateless Rohingya, Dhaka, viewed 14 March 2021, <http://www.thestateless.com/2017/02/bangladesh-policy-on-rohingya-refugees.html>.

Ullah, A 2011, 'Rohingya refugees to Bangladesh: Historical exclusions and contemporary marginalization', *Journal of Immigrant & refugee studies,* vol.9, no. 2, pp. 139-161.

Vas Dev, S 2002, The Reluctant Host: The Socio-Cultural Impact of Refugees on Developing Communities, Paper presented at the International Conference "The Refugee Convention, Where to from Here?" convened by the Centre for Refugee Research (Sydney, December 2001), Viewed 10 April 2021,
<http://motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP2102s.html>.

Ventura, A 2014, 'Identity, Conflict, and Statelessness in Southeast Asia. Study Case: The Predicament of Rohingya'.

Walton, MJ & Hayward, S 2014, *Contesting Buddhist Narratives Democratization, nationalism, and communal violence in Myanmar*, policy Studies, East-West Center, viewed 30 May 2021,
<https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/ps071.pdf>.

Whitaker, BE 2002, 'Refugees in Western Tanzania: The Distributions of Burdens and Benefits among Local Hosts', *Journal of Refugee Studies,* vol. 15, no. 4, pp. 339-358.

Wolf, SO 2014, 'The Rohingyas crisis: a security perspective from Bangladesh', *APSA Comment,* vol. 11, no. 21, pp. 1-11.

Wolf, SO 2017, 'Genocide, exodus and exploitations for jihad: the urgent need to address the Rohingya crisis', *SADF Working Paper,* 26 September 2017, issue no. 6, pp. 2-42, viewed 1 May 2020,
<https://www.sadf.eu/wp-content/uploads/2017/09/6WORKING PAPER.N.6.Rohingya. Wolf_.pdf>.

Yasmin, K 2017, 'Rohingyas' debate and 1951 International refugee convention: a security concerns analysis', *Journal of Alternative Perspective in the Social Sciences,* vol. 8, no. 4, pp. 401-423.

Yegar, Moshe1972, "*The Muslims of Burma",* Germany, pp. 133-135

Yesmin, Sultana 2016, 'Policy Towards Rohingya Refugees: A comparative Analysis of Bangladesh, Malaysia Thailand', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities),* vol. 61, no. 1, pp. 71-100.

Yue, C & Mensah BL 2017, 'Identity and the Rohingya question in Myanmar', *International Journal of Interdisciplinary Studies (IJIMS),* vol. 4, no. 3, pp. 473-481.

Yunus, Dr. Mohammed 1994, "A History of Arakan (past& Present", pp. 153-154.

Zaman, Mohammad 2019, 'Rohingya crisis: Issues and challenges that have emerged', *The Daily Star,* 19 January.

Zawacki, b 2012, 'Defining Myanmar's Rohingya Problem', *The Human Rights Brief*, vol. 20, pp. 18-25.

সংবাদপত্র, মিডিয়া, বিভিন্ন রিপোর্ট, জার্নাল ও অনলাইন সোর্স

Assessment Capacities Project (ACAPS) and needs and Population Monitoring (NPM) 2018, "Rohingya Crisis: Host Communities Review".Thematic Report. Geneva: ACAPS and IOM.

Advisory Commission on Rakhine state 2017, 'Towards a peaceful fair and prosperous future for the people of Rakhine', Final report, viewed 6 june 2020, <http://www.rakhinecommission.org/app/uploads/2017/08/FinalReport_Eng.pdf>.

Administrations for Refugee and Returnee Affairs (ARRA) 2011, Addis Ababa, Ethiopia.

Amnesty International 2017, *Who are the Rohingya and what is happening in Myanmar?*, Australia, viewed 2 June 2021, <http://www.amnesty.org.au/who-are-the-rohingya-refugees/>.

Amnesty International 2018, *Myanmar 2017/2018*, Naypyidaw, viewed 8 April 2020, <http://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/myanmar/report-myanmar/>.

Arakan Gas Research Team 2006, 'Shwe gas pipeline project to India: Another Yadana beings?', *The Shwe Gas Bulletin*, vol. 1, no. 10, viewed30 May 2020, <http://www.ibiblio.org/obl/docs3/SGB01-10-ocr.pdf>.

'At Least 288 Rohingya villages torched in Rakhine, says Human Rights Watch' 2017, Bdnews24.com, 17 October, viewed11 June 2020, <https://bdnews24.com/neighbours/2017/10/17/at-least-288-rohingya-villages-torched-in-rakhine-says-human-rights-watch>.

Bangladesh Institute of Peace and Security Studies (BIPSS) 2017, Rohingya refugee crisis in Bangladesh: A security perspective, Dhaka, viewed 2 April 2021, <http://bipss.org.bd/pdf/Rohingya_Crisis_in_Bangladesh.pdf>.
'Burmese government accused of trying to 'expel' all Rohingya Muslims' 2017, *The Independent*, 14 March, viewed 1 May 2021, <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/burma-rohingya-muslims-government-trying-to-expel-un-warning-a7629716.html>.

Census of India, 1931, vol, 5, Part-1, Appendix, 11

'Burmese government accused of trying to 'expel' all Rohingya Muslims' 2017, *The Independent*, 14 March, viewed 1 May 2021, <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/burma-rohingya-muslims-government-trying-to-expel-un-warning-a7629716.html>.

Census of India, 1931, vol, 5, Part-1, Appendix, 11

Deputy Commissioner's Office 2018, Cox's Bazar district web portal, Bangladesh, viewed 1 April 2021, <http://www.coxsbazar.gov.bd/site/page/96abff72-2144-11e7-8f57-286ed488c766>.

Department of Population 2015, 'The 2014 Myanmar Population and Housing census', *The Union Report,* Ministry of Immigration and population, vol. 2 Nay Pyi Taw, viewed 1 April 2021, <file:///C:/Users/Binary%20Gadget/Downloads/CensusmainReport(UNION)-ENGLISH%20(4).pdf>.

European Commission 2018, *The Rohingya crisis*, Echo Factsheet, viewed 30 March 2018, <http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/rohingya_en.pdf>.

French Press Agency (AFP) 2018, 'Muslim nations seek global pressure in Myanmar over Rohingya crisis', *The Daily Sabah*, 6 May, viewed 1 June 2021, <https://www.dailysabah.com/asia/2018/05/07/muslim-nations-seek-global-pressure-on-myanmar-over-rohingya-crisis>.

Frontieres-Halland, MS 2002, *10 years for the Rohingya refugees in Bangladesh: Past, present and future, Medicines Sans Frontiers*, New South Wales, Australia, viewed 8 March 2019, <http://www.rna-press.com/data/itemfiles/5ae98e43d068cb749b3060b002601b95.pdf>.

Human Rights Watch (HRW) 2013a, '*All You Can Do is Pray'. Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State*, Human Rights Watch, New York,USA, viewed 5 March 2021, <https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-andethnic-cleansing-rohingya-muslims>.

Human Rights Watch (HRW) 2013b, *Unpunished Crimes Against Humanity, Humanitarian Crisis in Arakan State*, Human Rights Watch, New York, USA, viewed 7 March 2019, https://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims>.

Human Rights watch(HRW) 2016, *Burma events of 2016*, Human Rights Watch, New York, USA, viewed 21 May 2020,

<https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/burma>.

Human Rights Watch (HRW) 2017, *Burma Events of 2017*, Human Rights Watch, New York, USA, viewed 4 April 2020, <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/burma>.

International crisis Group (ICG)2018, 'The long haul ahead for Myanmar's Rohingya refugee crisis', *Asia report N 296*, Belgium, viewed 19 May 2021, <https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/296-the-long-haul-ahead-for-myanmar.pdf>.

International Rescue Committee (IRC) 2014, *Uprooted by Conflict South Sudan's Displacement Crisis,* viewed 4 April 2021, <https://issuu.com/internationalrescuecommittee/docs/20141110_irc-southsudan_report>.

Inter Sector Coordination Group (ISCG) 2018, *Situation Report: Rohingya Refugee Crisis*, Cox's Bazar, viewed 30 March 2021, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/180211_weeklyiscg_sitrep_final_0.pdf>.

International Crisis group (ICG) 2013, *Myanmar's Nasaka':Disbanding an Abusive Agency,* International Crisis Group, Brussels, Belgium, viewed 2 April 2021, <http://blog.crisisgroup.org/asia/2013/07/16/myanmars-nasaka-disbanding-an-abusive-agency/>.

International Crisis group (ICG) 2014, 'Myanmar: The Politics of Rakhine State', *Asia report N 261*, International Crisis group, Brussels, Belgium, viewed 7 April 2020, <http://www.crisisgroup.org/medical/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/261-myanmarthe-politics-of-rakhine-state.pdf>.

International Crisis group (ICG) 2017, *Myanmar's Rohingya crisis enters a dangerous new phase*, Brussels, Belgium, viewed 27 April 2020, <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/292-myanmars-rohingya-crisis-enters-dangerous-new-phase>.

International Crisis group (ICG) 2018, 'The long haul ahead for Myanmar's Rohingya refugee crisis', *Asia report No.*296, Brussels, Belgium, viewed 19 May 2019, <https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/296-the-long-haul-ahead-for-myanmar.pdf>.

Inter-agency Working Group on Reproductive Health in Crisis (IAWG) 2018, Women and girls critically underserved the Rohingya humanitarian response, Relief Web, viewed 9May 2021, <https://reliefweb.int/report/bangladesh/women-and-girls-critically-underserved-rohingya-humanitarian-response>.

Kofi Annan Foundation2017, *Overview of key points and recommendations final report of the Advisory Commission on Rakhine State*, Advisory Commission on Rakhine state, viewed 7 June 2020,
<http://www.kofiannanfoundation.org/app/uploads/2017/08/20170822-Overview-of-key-points-and-recommendations.pdf>.
Medecins sans Frontieres 2017, *MSF surveys estimate that at least 6,700 Rohingya were killed during the attacks in Myanmar,* press release, 12 December, viewed 8 June 2020,
<https://www.msf.org/myanmarbangladesh-msf-surveys-estimate-least-6700-rohingya-were-killed-during-attacks-myanmar>.

Ministry of Foreign Affairs 2014, *Addressing the issue of Myanmar refugees and undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh: A summary persecution,* Strategy paper, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

'Myanmar's problem improved on Bangladesh' 2018, *The Daily Star,* 29 April, viewed 15 May 2020,
<https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/myanmar-internal-problem-in-bangladesh-foreign-affairs-minister-told-unsc-members-1569403>.

'Myanmar wants ethnic cleansing of Rohingya-UN official' 2016, *BBC News,* 24 November, viewed 20 May 2021,
<http://www.bbc.com/news/world-asia-38091816>.

'Myanmar: What sparked latest violence in Rakhine?' 2017, *BBC News,* 19 September, viewed 1 May 2021,
<http://www.bbc.com/news/world-asia-41082689>.

'Myanmar Rohingya: What you need to know about the crisis' 2018, *BBC News,* 16 January, viewed 21 May 2021,
<http://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>.

'Myanmar's problem imposed on Bangladesh' 2018, *The Daily Star,* 29 April, viewed 15 May 2020,
<https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis-myanmar-internal-problem-in-bangladesh-foreign-affairs-minister-told-unsc-members-1569403>.

'Myanmar wants ethnic cleansing of Rohingya-UN office' 2016, *BBC News,* 24 November, viewed 20 May 2021,
<http://www.bbc.com/news/world-asia-38091816>.

‘Myanmar: What sparked latest violence in Rakhine?’ 2017, *BBC News,* 19 September, viewed 1 May 2020,
<http://www.bbc.com/news/world-asia-41082689>.

‘Myanmar Rohingya: what you need to know about the crisis’ 2018, *BBC News,* 16 January, viewed 21 May 2020,
<http://ww.bbc.com/news/world-asia-41566561>.

‘No other coclusion’, ethnic cleansing of Rohingyas in Myanmar continues-Senior UN rights official’ 2018, *United Nations News,* 6 March, viewed 4 April 2021,
<https;//news.un.org/en/story/2018/03/100432>.

Northeastern University 2012, *Qualitative Research Methods: A Data Collector’s Field Guide,* viewed 29 April 2020,
<https://course.ccs.neu.edu/is4800sp12/resources/qualmethods.pdf>.

Ochab, EU 2018, ‘The international criminal court is looking into the crimes committed against the Rohingya Muslims’, *Forbes,* 18 May, viewed 1 June 2020,
<https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2018/05/18/the-internatiional-criminal-court-is-looking-into-the-crimes-committed-against-the-rohingya-muslims/#20f6024351cb>.

Office of Refugee Relief and Repatriation Commissioner (RRRC) 2015, *Brief on Myanmar Refugees & Undocumented Myanmar Citizen in Bangladesh,* Government of the People’s Republic of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh.

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 2017, Rohingya Refugee Crisis, Geneva, viewed 12 March 2021,
<https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis>.

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 2018, Rohingya refugee crisis, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), Geneva, viewed 10 May 2021,
<https://www.unocha.org/rohngya-refugee-crisis>.

Omeokachie, IV 2013, ‘The Security Implications of the Refugee Situation in south Africa’, MA Thesis, University of Pretoria, Pretoria, South Africa.
‘Rohingya crisis explained in maps’ 2017, *Al Jazeera,* 28 October, viewed 11 June 2021,
<https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/09/rohingya-crisis-explained-maps-170910140906580.html>.

‘Rohingya repatriation: Dhaka signs MoU with UNHCR’ 2018, *The Daily Star,* 13 April, viewed 2 May 2021,
<https://thedailystar.net/rohingya-crisis/myanmar-rohingya-refugeerepatriation-dhaka-signs-mou-unhcr-violence%20in%20rakhine-1562389>.

'Should it be Burma or Myanmar?' 2007, *BBC News*, 26 September, viewed 20 May 2018, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7013943.stm>.

United Nations Development Programme (UNDP) & UN Women 2017, *Social Impact Assessment of the Rohingya Refugee Crisis into Bangladesh key findings and recommendations*, New York, 6 December, viewed 5 May 2021, <https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/171207_social_impact_assessment_and_rapid_host_community_impact_assessment_summary.pdf>.

United Nations Development Programme (UNDP) 2018, *"Impacts of the Rohingya Refugee Influx on Host Communities"*, Dhaka, pp. 85-87.

United Nations (UN) 2017a, *Amid 'Humanitarian and Human Rights Nightmare' in Myanmar*, Secretary-General Urges Full Access for Aid, Safe Return of Displaced Rohingya, End to Military operations, Security Council, Meeting coverage, New York, viewed 28 April 2021, <https://www.un.org/press/en/2017/sc13012.doc.html>.

United Nations (UN) 2017b, 'At Security Council, UN chief Guterres makes case for new efforts to build and sustain peace', *UN News*, 10 January, viewed 30 May 20121, <https://news.un.org/en/story/2017/01/549122-security-council-un-chief-guterres-makes-case-new-efforts-build-and-sustain>.

United Nations n.d., *Universal Declaration of Human Rights*, New York, viewed 4 June 2021, <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 1992, *Implementation of the 1951 convention and the 1967 Protocol relating to the status of Refugees – some basic questions*, Geneva, viewed 2 May 2021, <http://www.unhcr.org/en-au/excom/scip/3ae68cca0/implementation-1951-convention-1967-protocol-relating-status-refugees-basic.html>.

Unnited Nations High Commission for refugees (UNHCR) 2003a, *A stateless person is someone who is "not considered as a national by any state under the operation of its law"*, Geneva, viewed16 May 2021, <http://www.refworld.org/docid/415c3cfb4.html>.

United Nations High Commission for refugees (UNHCR) 2007a, *Bangladesh Analysis of gaps in the protection of Rohingya refugees*, Bangladesh, viewed 20March 2021, <http://www.unhcr.org/en-au/protection/convention/46fa1af32/bangladesh-analysis-gaps-protection-rohingya-refugees-2007.html>.

United Nations High commission for Refugees (UNHCR) 2007b, *analysis of Gaps in the Protection of Rohingya Refugees*, Bangladesh, viewed 20 March 2021, <http://unhcr.org/protect/PROTECTION/46fa1af32.pdf>.

United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) 2012, *The Buddhist core values and perspective for protection challenges: Faith and Protection*, High commissioner's dialogue on Protection Challenges Themes: Faith and Protection, Geneva, viewed 7 May 2021, <http://www.unhcr.org/50be10cb9.pdf>.

United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) 2015, *Global trends forced displacement in 2015*, Geneva, viewed 2 April 2020, <http://www.unhcr.org/en-au/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html>.

United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) 2018a, *What is a Refugee*, Geneva, viewed 10 April 2021, https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/>.

United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) 2018b, *UN Launches 2018 appeal for Rohingya refugees and Bangladeshi host communities*, UNHCR & IOM, Geneva, viewed 30 April 2020, <http://unhcr.org/ph/13477-un-launchs-2018-appeal-rohingya-refugees-bangladeshi-host-communities.html>.

United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) 2018c, Operational update: Bangladesh (27 December 2017-7 January 2018), viewed 25 July 2021, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61561

United Nations Human rights Office of the Commissioner (OHCHR) 2017, 'Report of OHCHR mission to Bangladesh: Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 2016', *Flash Report*, OHCHR, viewed 1 June 2021, <http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlahReport3Feb2017.pdf>.

'UNHCR released annual global Trends report' 2018, *United Nations News*, 20 June, viewed 4 April 2021, <http://un.by/en/un-news/v-mire/3635-unhcr-released-annual-global-trends-report>

'2 Lakh Rohingyas went abroad with Bangladeshi passport: Minister' 2018, *The Daily Star* 28 April, viewed 5 May 2021, <https://www.thedailystar.net/country/2-lakh-myanmar-rohingyas-went-abroad-with-bangladeshi-passport-minister-1568974>.

অং, ডক্টর, ১৯৯১, “বার্মার মুসলিম সমাজ: অতীত এবং বর্তমান”, দৈনিক সংগ্রাম, মে ৩১, ১৯৯১।

আখতারুজ্জামান মোঃ, ২০০০, “আরাকানী রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উৎস ও ক্রমবিকাশ:একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১২০৪-১৭৮৫)”, ঢাকা: ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চবিংশ বর্ষ,বৈশাখ-চৈত্র ১৩৯৮।

ফেরদৌস, হাসান, ২০১৯, “পৃথিবীর নি:সঙ্গতম উদ্বাস্তু-রোহিঙ্গা” দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ৯, ২০১৯।

দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ মে, ২০২২।

দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ মে, ২০২২।

দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ জুন, ২০২২।

দৈনিক প্রথম আলো, ২০ জুন, ২০২২।

বাংলা বই

আখন্দ, মাহফুজুর, ২০১৩, “আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস”, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি।

আলম, মোঃ শামছুল, ২০১৪, “সমসাময়িক বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ইতিহাস”, ঢাকা: অবসর।

ইসলাম, মোহাম্মদ এমদাদুল, ২০২০, “রোহিঙ্গা:নি:সঙ্গ নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠী”, পৃষ্ঠা: ১৪, ঢাকা: প্রথমা ।

উদ্দিন, রাহমান নাসির, ২০১৭, “রোহিঙ্গা নয়, রোয়াইঙ্গা:অস্তিত্বের সংকটে রাষ্ট্রহীন মানুষ”, পৃষ্ঠা: ২৬, ঢাকা; মূর্ধন্য।

উদ্দিন, জামাল, ২০১৮, “লুণ্ঠিত আরাকানে রোহিঙ্গা জাতির আর্তনাদ”, চট্টগ্রাম: বলাকা।

উল্লাহ, হাবীব, ২০১৫, “রোহিঙ্গা জাতির িইতিহাস”, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি।

খান, মাইনুল, ১৯৯৮, “মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত”, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন।

সিদ্দিকী, মহিবুল্লাহ (সম্পাদিত), ২০০০, “আরাকানের মুসলমান: ইতিহাস ও ঐতিহ্য”, চট্রগ্রাম: আরাকান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি।